

স্বামী স্মরণানন্দ



রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া - ৭১১২০২

প্রকাশক :

স্বামী গৌতমানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২

৭ এপ্রিল ২০২৪

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

30 M

মূল্য : ২০ টাকা

মুদ্রক :

সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট

৯/৩, কে পি কুমার স্ট্রীট

বালি, হাওড়া - ৭১১২০১

স্বামী স্মরণানন্দ

বেলুড় মঠ। আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা আর সাধনচেষ্টায় নিত্যদিন মুখর। সেখানেই একদিন তুলনায় এক নবীন ও এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর কথোপকথনের একটি অংশ শোনা যাক। নবীন সন্ন্যাসীটির প্রশ্ন : ‘মহারাজ, আপনাকে তো কখনো দেখিনা দীর্ঘ সময় ধরে জপ-ধ্যান করতে ; দীর্ঘ তীর্থযাত্রাতে বা তপস্যা করতে যেতেও তো দেখিনি আপনাকে – তাহলে, আপনার জীবনে আধ্যাত্মিক পথে এইভাবে নিরন্তর এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে মুখ্য সাধনাটি কী?’ একটুও ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত না হয়ে, হাসতে হাসতে প্রবীণ সেই সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, ‘দুটি বিষয় জীবনে মনে রেখো, এক – ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিত্যা এই বৈদান্তিক সত্যকে জীবনসাধনা করে তোলার চেষ্টা করো ; আর দুই – এক সরল, নিঃসহায় শিশুর মত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করো। দ্যাখো, যে মুহূর্তে আমি বুঝলাম যে এই জগত অনিত্য, সেই মুহূর্তে দুটি বিষয় আমার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেলো, এক – আমার জীবনের লক্ষ্য কী এবং, দুই – সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে আমাকে কোন্ পথে চলতে হবে ? যদিও লক্ষ্য ও পথ দুইই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তবুও আমি জানতাম যে, আমার শরীর ও মনের যে সামর্থ্য আছে, তার থেকে বেশী দ্রুত আমি এগোতে পারবো না। তাই আমার বাইরের আর ভিতরের শক্তি অনুযায়ী এবং ঠাকুরের উপর নির্ভর করে আমি আমার নিজস্ব গতিতেই এগিয়ে চলেছি। দ্রুত কিছু পেতে হবেই, এই মনে করে কখনও আমি অধৈর্য হয়ে পড়ি নি, আবার আমার চলার পথের অগ্রগতির ব্যাপারটিও কখন আমার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায় নি। রহস্যটা এখানেই : শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিজেই সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করো, ঠাকুরকে তোমার শরীর, মন, প্রতিভা প্রভৃতি সমস্ত কিছু তাঁর কাজে তাঁরই ইচ্ছামত ব্যবহার করতে দাও। সবসময় তাঁরই উপর নির্ভর করো, সবসময় তাঁকে স্মরণে রাখার চেষ্টা করো এবং তাঁর জন্যে কাজ করে যাও। দেখবে, তিনিই বাকী সমস্ত কিছুর দায় গ্রহণ করবেন।’ এই ঘটনার প্রবীণ সন্ন্যাসীই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষোড়শ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ – যিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক সাধনার উক্ত মহান আদর্শটিকে সারাটি জীবন এক অনাড়ম্বর সরলতায় পালন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই আদর্শের অন্যতম এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রী ভি জয়রমন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এইজন্যেই তিনি জয়রাম মহারাজ নামে পরিচিত হয়েছেন। ১৯২৯ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তদানীন্তন মাদ্রাজ রাজ্যের (বর্তমানে তামিলনাড়ু) তাঞ্জোর (বর্তমানে তাঞ্জাবুর) জেলার আন্দামি নামে একটি ছোট গ্রামে মাতামহের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন জয়রাম। তাঁর বাবার নাম ছিল শ্রী আর ভেক্টরমন আর মায়ের নাম ছিল সুব্বালক্ষ্মী। কিছুদিন সৈন্যবাহিনিতে কাজ করে তাঁর বাবা শেষ পর্যন্ত মহারাজের নাসিক জেলার নাসিকরোডে থাকতে শুরু করেন এবং ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেসে কর্মরত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জয়রাম মহারাজের ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছিল তাঁর পিসিমা আলামেলুর বাড়িতে, মাদ্রাজে এবং ত্রিচি জেলার কুলিভালাই অঞ্চলে অখণ্ড কাবেরির তীরে। প্রথমে কর্পোরেশন স্কুলে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে তিনি নাসিকে চলে যান এবং সেখানে এক বছর থেকে আবার ফিরে আসেন মাদ্রাজে। এবারে তিনি পঞ্চম ক্লাসে ভর্তি না হয়ে, সোজাসুজি মাদ্রাজের হিন্দু হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তাঁর পিসিমারা

ত্রিটি জেলার কুলিভালাই-এ চলে যান এবং পূজনীয় মহারাজ সেখানে কুলিভালাই বোর্ড হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর তাঁরা আবার ফিরে আসেন মাদ্রাজে এবং মহারাজ নবম শ্রেণিতে পূর্বের হিন্দু হাই স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় তিনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাই হোক, এসব সত্ত্বেও তিনি নবম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, জাপানিরা মাদ্রাজ শহরের উপর বোমাবর্ষণ করেছে। ফলত তাঁরা আবার কুলিভালাই-এ ফিরে আসেন এবং পূজনীয় মহারাজ দশম শ্রেণিতে পূর্বের বোর্ড হাই স্কুলে ভর্তি হন। এইখানে থেকে তাঁর স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হয়। এই বিদ্যালয়ের স্নেহশীল প্রধানশিক্ষকের কথা মহারাজের পরবর্তীকালেও মনে ছিল। প্রধানশিক্ষক মহাশয় একবার ছাত্র জয়রামের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, ‘দ্যাখো তোমাকে পরীক্ষায় ভালো নাস্বার পেতে হবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে হবে।’ হয়েও ছিল তাই। ১৯৪৬-এ তখনকার দিনে একাদশ শ্রেণিতে পাঠের শেষে আয়োজিত এসএসএলসি পরীক্ষায় তিনি খুব ভালো ফল করেছিলেন। পরীক্ষার পরেই তিনি মাদ্রাজ হয়ে নাসিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে একদিনের জন্যে তিনি কুম্ভকোনমে থেকে ছিলেন। এখানে তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের একটি শিবির চলছিল। মহারাজ সেখানে অংশ নেন।

নাসিকে পৌঁছে বাবার নির্দেশে তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে নজর দেন। বাবা তাঁর জন্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে কে ভি আয়ারের পোস্টাল ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের একটি কোর্স নিয়ে আসেন এবং সেটিকে অনুসরণের নির্দেশ দেন। সেইমত এগিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর শরীরের বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময় তিনি নাসিকে হিন্দু জিমখানাতে যোগদান করেন ব্যাডমিন্টন খেলার জন্যে। নাসিকে সেইসময় তেমন ভালো কলেজ ছিল না আর তাঁর বাবারও আর্থিক সামর্থ্য তেমন ছিল না যে কোন হোস্টেলে রেখে তাঁর পড়াশুনা চালাবেন। তাই বাবার পরামর্শেই তিনি বাড়িতে থেকেই পোস্টাল টিউশনের মাধ্যমে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের দ্বারা অনুমোদিত বিজনেস অরগানাইজেশনের উপর একটি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করেন। এরপর তিনি লণ্ডন চেম্বার অব কমার্সের থেকে একইভাবে আর একটি কোর্সের পড়াশুনাও শুরু করেছিলেন, যদিও সেটি আর শেষ করেন নি। বাবার চেষ্টাতেই জয়রাম ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি থ্রেসে ক্লার্কের পদে একটি অস্থায়ী কাজ পান। এখানকার একটি ঘটনা তিনি পরবর্তীকালেও বলতেন। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী এই থ্রেসের প্রধান ছিলেন একজন ইংরেজ, নাম আর সি চ্যাপম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে সেবার ইংল্যাণ্ডে অলিম্পিক গেম্‌স শুরু হয়েছে। চ্যাপম্যান সেটি দেখবার জন্যে ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি জয়রামকে ডেকে পাঠান। অফিসের অন্যেরা অবাক হয়ে যান এই ভেবে যে, এই একটি আঠারো বছরের ছেলেকে অফিসের প্রধান ডেকে পাঠাচ্ছেন কেন। আসলে চ্যাপম্যান মহারাজের বাবার কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন যে জয়রাম স্ট্যাম্প কালেকশান করতে ভালোবাসেন। জয়রাম তাঁর ঘরে ঢোকান পরে তিনি জয়রামের হাতে সেবারের অলিম্পিক গেমসের ‘ফার্স্ট ডে কভার’টি তুলে দেন। চ্যাপম্যানের এই ব্যবহার জয়রামকে মুগ্ধ করেছিল। ইতিমধ্যে বোম্বেতে কাজের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেখানে ক্লার্কের পদে যোগ দেন ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে। বোম্বেতে তিনি থাকার জায়গা খুঁজতে শুরু করেন এবং নানা স্থান ঘুরে অবশেষে

ওরলি নাকা অঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্যে রাখা একটি ভাড়া বাড়িতে আরো কয়েকজনের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। এই সময়ে তাঁর সারাদিনের কাজের চাপ ছিল খুব বেশি, কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের বাইরেও এই সময় তিনি দুটি কলেজে পড়াশুনা শুরু করেছিলেন। বি এ কোর্সে তিনি ভর্তি হন জয় হিন্দ কলেজে, এটি ছিল একটি মর্নিং কলেজ। আবার অফিসের পর তিনি যেতেন লাক্ষ্মী কলেজ অব কর্মাঙ্গে, সেখানে তিনি ব্যাঙ্কিং-এ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। এর পরীক্ষায় পাশ করে তিনি আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত গগনবিহারি লাল্লুভাই মেহতার কাছ থেকে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়েই তিনি Certified Associateship at the Indian Institute of Bankers বা CAIIB কোর্সটিও পড়া শুরু করেন এবং দুটি পত্র ছাড়া আর সব পত্রের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রায় তিন বছর কাজ করেছিলেন তিনি। সেই সূত্রে ভারতের প্রথম আদমসুমারি এবং ১৯৫১-তে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও তিনি কর্মী হিসেবে অংশ নেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রথম ভারতীয় গভর্নর সি ডি দেশমুখের অবসর গ্রহণের ঘটনারও সাক্ষী ছিলেন তিনি। কর্মজীবনের প্রচণ্ড কঠোরতার পাশাপাশিই তাঁর কয়েকটি প্রিয় বিষয় ছিল ক্রিকেট খেলা দেখা, কিছু ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দেখা আর গ্রন্থপাঠ। মীরাবাই ছবিটি তিনি তামিল, হিন্দি এবং মারাঠি তিনটি ভাষাতেই দেখেছিলেন। ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের টেস্ট ম্যাচ দেখেছিলেন যেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থ্রি ডার্লিউ (Three ‘W’ – Sir Frank Worrell, Sir Everton Weekes, Sir Clyde Walcott) এবং ভারতের লালা অমরনাথ, দাত্তু ফাদকার প্রভৃতিদের খেলতে দেখেছিলেন। নেপোলিয়ন হিলের লেখা ‘Think and Grow Rich’, ‘The Master Key of Riches’, মহাত্মা গান্ধির ‘Self-Indulgence vs Self-Control’, ‘The Story of My Experiments with Truth’ প্রভৃতি ছিল তাঁর পছন্দের গ্রন্থ, যেগুলি তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কর্মজীবনের এই নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততাই কিন্তু যুবক জয়রামের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, সেখানেই থাকতেন সুরেন্দ্র নাথ মেনন নামে আর একজন, যাঁর সঙ্গে সাধারণত তিনি অফিসে যাতায়াত করতেন। ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে এসে পড়েছে স্বামীজীর কয়েকটি বই। এছাড়াও গান্ধিজির বইও তিনি তখন পড়ছেন। একদিন মেননকে তিনি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন, ‘আচ্ছা মেনন, প্রতিদিনই আমরা সকাল দশটায় অফিস যাই আর ফিরে আসি বিকেল পাঁচটায়। তারপর খাওয়া-দাওয়া, কিছুটা আনন্দ-হুগ্লোড় করা, ক্রিকেট খেলা দেখা ইত্যাদি। তিরিশ বছর বা আরো বেশি বা কম সময় এইভাবেই তো আমাদের দিন চলে যাবে, বিবাহ, সংসার জীবনযাপন আর শেষে মৃত্যু। তাহলে এই জীবনের অর্থ কী? কিসের জন্যে এই সমস্ত কিছু?’ মেনন কিছুটা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, ‘দ্যাখো এইসব বোলো না, সবাই তো আর মহাত্মা গান্ধি হতে পারে না।’ জয়রামের স্পষ্ট উত্তর, ‘আমি তো মহাত্মা গান্ধি বা অন্য কারুর মত হতে চাই না। আমি শুধু জীবনের অর্থ আর তাৎপর্য খুঁজতে চাই। আমি আমার প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজছি। আমি শুধু জানতে চাই কেন আমরা এইসব করে চলছি?’ এই সময় তিনি মাঝেমাঝেই একা একা ওরলি সমুদ্রসৈকতে গিয়ে বসে থাকতেন নির্জনে। সৈকতে পড়ে থাকা বিরাট প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে ভাবতেন – আচ্ছা এই যে এত বড় বড় পাথর, এই যে বিরাট-বিস্তৃত সমুদ্র, এই যে অনন্ত আকাশ – এর প্রেক্ষাপটে আমি তো কত ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে। ঠিক পরক্ষণেই তাঁর

ভিতর থেকে কে যেন উত্তর দিত, একথা হয়তো ঠিক এই বিপুল ধরণীর প্রেক্ষিতে তুমি হয়তো অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমার ভিতরেই রয়েছে এক বিরোটের উপস্থিতি, যে কিনা এদের সবার চাইতেই অনেক অনেক বড়, অনেক মহৎ। নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর এই অনুভবের কথা, মানসজগতের এই অপূর্ব দিব্যভাবের বর্ণনা দিতেন তিনি, ‘তখন আমি গান্ধিজির আত্মজীবনী ‘The Story of My Experiments with Truth’ পড়ছি। এই বইতে গান্ধিজি যে ব্রহ্মচর্যের উপর বিরোট গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। গান্ধিজি এখানে বলেছিলেন যে যখনই তাঁর মন দুর্বল হয়ে পড়ত, তখনই তিনি রামনাম জপ করতে শুরু করে দিতেন। আমিও এই কথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রামনাম জপে আকৃষ্ট হই। অফিস থেকে ফিরে চলে যেতাম মেরিন ড্রাইভের নির্জন সৈকতে, সমুদ্রের ধার অবধি হেঁটে যেতাম রামনাম জপ করতে করতে। ...নেপোলিয়ন হিলের বইতে আমি তিনটি বিষয় পড়েছিলাম, ১) একজন মানুষের জীবনে একটি আদর্শ থাকতে হবে, ২) সেই আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্যে তার জীবনে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, ৩) সেই আদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্যে চাই প্রবল অধ্যবসায়। আমি ভাবতে শুরু করলাম, তাহলে আমার জীবনের আদর্শ কী? আমি কল্পনা করলাম যে আমি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ হতে পারি, অথবা আমি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারি; কিন্তু এই জাতীয় কোন কল্পনাই আমাকে তৃপ্ত করতে পারলো না। এই সমস্ত বইগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে প্রশ্ন জাগতে লাগলো, তাহলে আসল সত্য কী? একদিন একটি ডাবল ডেকার বাসের উপর তলায় বসে যাচ্ছি, বেশ কিছুদিন ধরেই ঐসব নানা চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, আমার জীবনের আদর্শ কী, আমার কী করা উচিত? হঠাৎই ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, আমাকে সাধু হতে হবে। উদ্দেশ্য স্থির হয়ে গেল, আমি এবার সাধু হওয়ার জন্যেই চেষ্টা শুরু করলাম।’ পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গ করতে করতে তিনি নবীন এক সাধুকে বলেছিলেন, এই পর্বটাই ছিল তাঁর জীবনের ‘First Awakening’। এরপর তিনি আর অন্য কোনদিকে ফিরে তাকান নি। জীবনের লক্ষ্য ও তার পথের উপর এত গভীর বিশ্বাস তাঁর জন্মে গিয়েছিল যে, সেখানে কখনও কোন সন্দেহ আর সংশয় তাঁকে বিব্রত করতে পারে নি। বস্তুত তিনি বলতেন, এই বিশ্বাসের গভীরতা সারা জীবন ধরে এমনই ছিল যে, কোন গুরুতর আধ্যাত্মিক প্রশ্নও তাঁর জাগে নি, কারণ জীবনের উদ্দেশ্য ও পথ তখন তাঁর কাছে চিরকালের জন্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট।

এইসময়ই বোম্বের খারে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্রের খোঁজ পান মহারাজ এবং সেখানে সপ্তাহান্তে যাতায়াত শুরু করেন। রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে রামনাম জপ করতে করতে বালিশ ভিজে যেত চোখের জলে। আশ্রম থেকে স্বামীজী আর ঠাকুরের বই কিনে এনে পড়া তখন তাঁর নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কথামতে পড়লেন একদিন যে ঠাকুর বলেছেন নির্জনে গিয়ে তিন দিন সাধনা করো, গভীরভাবে প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই ভগবানের দর্শন পাবে। এটি পড়ে তিনি খুব উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, এই চেষ্টাই তাঁকে করতে হবে। দুটি পোস্ট কার্ডে দুটি আলাদা চিঠি লিখলেন। একটি মেননকে লিখে জানালেন যে তাঁর কয়েকটি বই আশ্রমের গ্রন্থাগারে ফেরৎ দিয়ে দিতে, আর একটি চিঠি লিখলেন তাঁর বাবাকে, জানালেন যে, আমি চলে যাচ্ছি, আমার জন্যে কোন চিন্তা কোরো না। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছেও চিঠি দুটি পোস্ট করতে পারলেন না। চলে এলেন বোম্বে আশ্রমে। সেখানে

তখন অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ছিলেন না। যুবক জয়রাম দেখা করলেন স্বামী অপর্ণানন্দজীর (সত্য মহারাজ) সঙ্গে। সত্য মহারাজকে তিনি বললেন যে, তিনি আর বাড়ি ফিরে যাবেন না। যাই হোক, সত্য মহারাজ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, ‘এইভাবে তো হঠাৎ করে সঙ্ঘে যোগদান করা যায় না। তুমি বরং আশ্রমে কিছুদিন যাতায়াত করতে থাকো, তারপর যোগদান করো।’ মহারাজের নির্দেশ মত যুবক জয়রাম সেদিনের মত ফিরে গেলেন তাঁর আস্তানায়। কিন্তু জীবনের অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় স্পৃহা তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভোর চারটেয় উঠে তিনি পৌঁছে যেতেন আশ্রমের মন্দিরে, তারপর যেতেন শহরে অন্য কাজকর্মে। রবিবার সারা দিনটা কাটত তাঁর আশ্রমে। আরো বেশি করে পড়তে শুরু করেন স্বামীজীর বই। এমনও হয়েছে যে ট্রেনে যেতে যেতে স্বামীজীর বই পড়ায় তিনি এত মগ্ন হয়ে গিয়েছেন, তাঁর গন্তব্য স্টেশনটি ছাড়িয়ে আরো দু-তিনটি স্টেশন পরে গিয়ে নেমেছেন। ১৯৫১-র জুন মাসে যুবক জয়রাম রামকৃষ্ণ মঠের স্টুডেন্টস্ হোমে চলে আসেন। এই সময়েরই আর একটি ঘটনা নিজের মুখে বলেছেন তিনি, ‘একদিন মন্দিরে ধ্যান করতে করতে মনে মনেই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ইষ্ট কে ? মন্দিরের ঠাকুরের ছবির থেকেই যেন উত্তরটি তাঁর কাছে পৌঁছে গেল, আমিই তোমার ইষ্ট।’ সেই থেকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকেই তিনি তাঁর ইষ্ট বলে গ্রহণ করেন, যদিও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাজরাজেশ্বরী মাতার প্রতিও তাঁর গভীর ভক্তি চিরকাল ছিল। ইতিমধ্যে তিনি বি এ কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষাটিও দেন এবং তারপরেই ১৯৫২-র ২৮এ ফেব্রুয়ারি বোম্বে আশ্রমে যোগদান করেন। পরে অবশ্য তিনি জেনেছিলেন যে, বি এ পরীক্ষায় তিনি পাশ করে গিয়েছেন, কিন্তু এর মার্কশিট বা সার্টিফিকেট কখনই তিনি নিয়ে আসেন নি। সঙ্ঘে যোগদানের কথা তিনি তাঁর বাবাকেও পত্র মারফৎ জানিয়ে দেন। এই নিয়ে পিতা-পুত্রের একটি অতি চমৎকার পত্রালাপও হয়েছিল, যেখানে যুবক জয়রাম মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যকে সুন্দর এক সজ্জিত যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূজনীয় জয়রাম মহারাজের বাবা মাদ্রাজ মঠেই পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন লাভ করেছিলেন। বোম্বে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী তাঁকে বলেছিলেন যে, এ কারণেই তাঁর সন্তান জয়রাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছেন।

বোম্বে আশ্রমে তাঁর প্রথম কাজ ছিল ঠাকুরঘরের ভাণ্ডারে। যেহেতু বোম্বে আশ্রমের ঠাকুরঘরে বেলুড় মঠের মত প্রায় সমস্ত কিছুই পালন করা হয়, তাই একেবারে ভোরবেলা থেকে শুরু করে রাত নয়টা পর্যন্ত তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হতো। তখন সেখানে পূজারী মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী আশুতোষানন্দজী বা বটকৃষ্ণ মহারাজ, সাধারণভাবে তাঁকে সবাই বটুক মহারাজ বলে জানতো। বটুক মহারাজ ইংরেজী জানতেন না আর জয়রাম মহারাজ বাংলা জানতেন না। তাই দুজনের কথোপকথন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মন্দিরে কোন কাজ করার সময়, ব্যবহৃত বাসন বা জিনিসে হাত দিয়ে ফেললে, প্রথমে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে নিতে হবে—এই বিষয়টি শেখানোর জন্যে বটুক মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, “See Jayram, this thing, Jhutha, hand wash!” পূজনীয় জয়রাম মহারাজ কিন্তু বটুক মহারাজের স্নেহসান্নিধ্যে থেকে ধীরে ধীরে সব কাজই শিখে নিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালে একদিন শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী তাঁকে জানালেন যে, সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ আসছেন এবং তাঁর কাছে থেকে

আশ্রমে সদ্য-যোগদান-করা ব্রহ্মচারী জয়রামকে মন্ত্রদীক্ষা নিতে হবে। কিন্তু জয়রাম ভাবতে শুরু করলেন যে যাকে তিনি একবারও দেখেন নি, তাঁর কাছ থেকে তিনি কেমন করে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করবেন। শেষে স্থির করলেন যে পূজ্যপাদ মহারাজ এলে তাঁকে দেখে যদি তাঁর মনে হয় যে, এনার কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া যাবে, তবেই তিনি নেবেন, নতুবা আশ্রম ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যাবেন। ১৩ বা ১৪ই ডিসেম্বর পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী মহারাজ আশ্রমে এলেন, তাঁকে একটি হলঘরে বসানো হলো, সব সাধু-ব্রহ্মচারীরা এবং ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করলেন। জয়রামও প্রণাম করেছিলেন। তারপর তিনি জানলা দিয়ে পূজনীয় মহারাজের সেই অপূর্ব রাজকীয় উপস্থিতিটি দেখছিলেন, পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের চোখ দুটি ছিল যেন অন্তর্মুখ। পূজনীয় মহারাজের মনে হলো, কি অপূর্ব এই পবিত্র দিব্যপুরুষ! ঠিক করলেন যে, এনার কাছ থেকেই মন্ত্রদীক্ষা নেবেন তিনি। ১৯৫২-র ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর মন্ত্রদীক্ষা হলো। পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী আশ্রমে আরো ১৫ দিন মত ছিলেন। এর মধ্যে দুইবার তিনি পূজনীয় মহারাজের কাছে যাওয়ার সাহস অর্জন করেছিলেন। নিজেই তিনি সে-কাহিনির স্মৃতিচারণ করতেন, ‘এক দিন সকালে আমি মহারাজের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবো ভাবলাম। তাঁকে দেখতে খুব গম্ভীর ছিল আর গলার স্বরও ছিল রাশভারি, তাই যে-কেউই তাঁর কাছে সহজে যেতে পারতো না। যে-মুহূর্তে আমি তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছি, সেই মুহূর্তে তিনি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন N-o-t s-o e-a-r-l-y। সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে চলে এলাম। ...আর একদিন আমি পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, মহারাজ স্বামীজী বলেছেন যে পূজা খুব অল্প খরচের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এখানে দুর্গাপূজা খুব বড় করে সম্পন্ন করা হয়। শুনে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলে উঠলেন, স্বামীজী নিজেই বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা চালু করেছিলেন। আমি খুব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।’ এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও তিনি বলতেন, ‘আমি পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের সেক্রেটারি পূজনীয় স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজকে (সতীনাথ মহারাজ) বললাম যে, আমি জপমালা পেতে পারি কিনা। শুনে সতীনাথ মহারাজ বললেন যে, জপমালার কোন প্রয়োজন নেই। যদি তুমি পূজনীয় মহারাজের কাছ থেকে জপমালা চাও উনি খুব রেগে যাবেন। বস্তুত সাধারণভাবে তিনি জপমালা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বামী প্রভানন্দজী (বরুণ) মহারাজ, বেশ কিছুদিন পূজনীয় মহারাজের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে মহারাজের কাছ থেকে জপমালা পেয়েছিলেন।’

ইতিমধ্যেই জয়রাম মহারাজ সন্ধ্যারতি শিখে নিয়েছিলেন। এছাড়াও কাজের প্রয়োজনেই এই পর্বে তিনি সাইকেল চড়া ও টাইপ করাও শিখেছিলেন। বস্তুত হাতের দুই আঙ্গুল (তর্জনী) দিয়েই তিনি খুব দ্রুত না দেখেই টাইপ করতে পারতেন। এই শিক্ষা পরবর্তীকালে অদ্বৈত আশ্রমে থাকার সময় খুব কাজে লেগেছিল। সাইকেল চড়াটা খুব ভালোভাবে তিনি আয়ত্ত্ব করতে পারেন নি এবং দুটি ঘটনার পর এটি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। একবার সাইকেল চড়ে যাচ্ছেন একটি কাজে, এমন সময় হঠাৎ একটি শিশু তার সাইকেলের সামনে চলে আসে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে সাইকেল ঘোরান এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি নর্দমায় গিয়ে পড়েন, অবশ্য সৌভাগ্যবশত তাঁর খুব বেশি আঘাত লাগে নি। দ্বিতীয়বার একটি বড় রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন। খেয়াল করেন নি যে মোড়ের মাথায় ট্যাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে গিয়েছে। অন্যদিক থেকে গাড়িগুলি চলতে শুরু করেছে, তিনিও একটু

এগিয়েছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন কে একজন পিছন থেকে চিৎকার করে বলছেন, ‘ইএ গুরুরাজ, কঁহা মরণে জা রহে হো’। থেমে যেতেই দেখলেন ট্রাফিক পুলিশ তাঁকে ডাকতে শুরু করেছে।

বোম্বে আশ্রমে মন্দিরে কাজ করার সময়ের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা তিনি পরবর্তীকালে বলতেন। তিনি যখন ঠাকুর ভাণ্ডারে কাজ করছেন, তখন গোপীনাথ নামে একটি আট-নয় বছরের বালক প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতি দর্শনে আসত। একদিন সে জিজ্ঞাসা করলো, ‘আচ্ছা মহারাজ, পূজারী মহারাজ ফুল ছুঁড়ে আরো নানা কিছু করে এইভাবে পূজা করেন কেন, ভগবানে ভক্তি থাকাই কি যথেষ্ট নয়?’ একদিন তিনি গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আচ্ছা গোপীনাথ, তুমি বড় হয়ে কী হবে?’ সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, ‘আমি সাধু হবো। তবে আপনাদের মত নয়। আমি কোন নির্জন স্থানে চলে যাবো আর ভগবানের ধ্যানচিন্তা করবো।’ এর কিছুদিন পর থেকে গোপীনাথ আসা বন্ধ করে দিল। কয়েক মাস পর একদিন তার বাবা এলেন। মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘গোপীনাথ কেন আসছে না?’ তার বাবা উত্তর দিলেন, ‘তার ডিপথিরিয়া হয়েছিল, আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে সে তিনবার শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেছিল।’ পূজনীয় মহারাজ বলতেন যে বালকটি নিশ্চয়ই আগের জন্মে সাধক ছিল। কিছু কর্মভোগ হয়ত বাকী ছিল, এজন্মে তার তা শেষ হয়ে গেছে। সে মুক্তি লাভ করেছে।

কিছুদিন মন্দিরে কাজ করার পর জয়রাম মহারাজ পূজনীয় সম্বুদ্বানন্দজীকে ছুটির জন্যে প্রার্থনা জানান। সম্বুদ্বানন্দজী এতে ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন যে, জয়রাম একজন সক্রিয় ছেলে, সে কেন এইভাবে ছুটি চাইছে – হৃষিকেশে গিয়ে রাতারাতি সন্ন্যাস পাবে বলে কি। এছাড়াও তিনি বলেন যে আহমেদনগর জেলায় খরার জন্যে ত্রাণকাজ শুরু হয়েছে। সেই সেবায় বরং তার নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত। এই কথা শুনে জয়রাম মহারাজ বলেন যে তিনি ত্রাণকাজের জন্যে যেতে প্রস্তুত। একথা শুনে সম্বুদ্বানন্দজী খুব খুশি হন এবং রাতের ক্লাসে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের এই কথা জানান। আহমেদনগরে ত্রাণকাজ দেখাশুনা করছিলেন স্বামী রাঘবেশ্বরানন্দজী মহারাজ (নরেন মহারাজ)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী আদিনাথানন্দজী (কালিদা মহারাজ) এবং স্বামী সৌম্যানন্দজী (দ্বিতীয় নরেন মহারাজ)। বাকী তিনজন মারাঠি জানতেন না বলে জয়রাম মহারাজের উপর ভার পড়ে আহমেদনগরের ফ্রি-কিচেনটি পরিচালনার। ডাল, বক্রি এবং জোয়ার ও আটার তৈরী রুটি দেওয়া হত গ্রামের মানুষদের। চার মাস এই ত্রাণকাজ চলে। এরপর সম্বুদ্বানন্দজী জয়রামকে পুনরায় বোম্বে আশ্রমে ফিরে আসতে বলেন। এই সময় জয়রাম মহারাজ সম্বুদ্বানন্দজীর কাছে আট-দশ দিনের ছুটি প্রার্থনা করেন যাতে তিনি অজন্তা, ইলোরা এবং ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করে আসতে পারেন। এই ছুটি মঞ্জুর হয়। সেই সময় ঐ সব অঞ্চলে যাতায়াত খুব কষ্টকর ছিল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও একেবারে ভালো ছিল না। যাই হোক, তারই মধ্যে মহারাজ দ্বাদশ জ্যোতির্লিপির অন্যতম ঘৃণেশ্বর দর্শন করেন। সেখান থেকে ইলোরা দেখে আসেন দৌলতাবাদে। তারপর অজন্তা পৌঁছান। কিন্তু ওঙ্কারেশ্বর দর্শন তাঁর আর সম্ভব হয় নি। তিনি ফিরে আসেন বোম্বে আশ্রমে।

এই পর্বে আশ্রমে ফিরে এসে তিনি আশ্রমের মূল কার্যালয়ে কাজ শুরু করেন। প্রথমে অন্য দুইজন মহারাজ এই কাজের দায়িত্বে এলেও, কিছুদিনের মধ্যেই, এর প্রধান দায়িত্ব চলে আসে পূজনীয় জয়রাম মহারাজের কাঁধে। এই সময়ে কিছুদিন

ধরেই তিনি সম্মুদ্বানন্দজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁকে কয়েকদিনের ছুটি দিতে, যাতে তিনি বেলুড় মঠ দর্শন করতে যেতে পারেন। সেই সুযোগ তাঁর কাছে এসে পৌঁছায় একবছর পরে। মায়ের আবির্ভাবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব তখন চলছে। সেই উপলক্ষে ১৯৫৪-র ৯ই এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নাটমন্দিরটিও বড় করা হবে। সম্মুদ্বানন্দজীর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনিই জয়রাম মহারাজকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে চললেন। কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে তাঁরা প্রথমে পৌঁছালেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে যেখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের একটি গাড়ী তাঁদের নিয়ে গেল গোলপার্ক। সেখানে স্নান-খাওয়া সেরে তাঁরা প্রথমে গেলেন বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে। মাকে দর্শন করে পৌঁছালেন দক্ষিণেশ্বর কালিমন্দিরে। তাঁর কাছে এই তীর্থদর্শন ছিল যেন স্বপ্নের মত। সেখান থেকে এলেন বেলুড় মঠে। সম্মুদ্বানন্দজী তাঁকে কয়েকদিন বেলুড় মঠে থেকে তারপর জয়রামবাটিতে যেতে বললেন। মঠে তখন তাঁর পরিচিত অপর্ণানন্দজী মহারাজ ছিলেন। তিনিই ব্রহ্মচারী জয়রামকে বেলুড় মঠের সমস্ত স্থান এবং আরো কিছু শাখাকেন্দ্রে নিয়ে যান। বেলুড় মঠে থাকাকালীন একটি মজার ঘটনা ঘটে। সেই সময় তিনি বেলুড় মঠে থাকতে পেয়েছিলেন গিরিশ মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর উপরে, পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের ঘরের উপরে। একদিন তিনি উপর থেকে কাপড় কাচার জন্যে ঘরে ঢাবি দিয়ে নেমে এসেছেন ; ফিরে এসে আর ঢাবিটা পাচ্ছেন না, কার্নিসের উপর তিনি রেখে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি উপর থেকে একটি গলা শুনতে পেলেন, পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁকে বেশ কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘তুমি কী খুঁজছো ?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘ঢাবি’। ‘কোথায় রেখেছিলে ?’ ‘মনে হয় কার্নিসে।’ ‘মনে হয় বলছো কেন?’ ‘এখানে কার্নিসে’। তখন তিনি ঢাবিটা হাতে নিয়ে বললেন, ‘এই তো ঢাবি। এটি আমি আমার কাছে রেখে দেবো। তোমরা কিছুই খেয়াল রাখো না। ঘরের ভিতরে কে আছে-না-আছে না দেখেই ঘরে তালা দিয়ে চলে যাও।’ জয়রাম মহারাজ বুঝতে পারলেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে বললেন যে, তিনি এই জায়গায় নতুন, তাই এইসব জানেন না। তাঁর কথা শুনে পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী একটু নরম হলেন এবং ঢাবিটা তাঁকে ফেরৎ দিলেন।

বেলুড় মঠে ১১ দিন থাকার পর অপর্ণানন্দজীর সঙ্গে তিনি জয়রামবাটি পৌঁছালেন। সেখান থেকে একদিন হেঁটে তিনি কামারপুকুর মঠেও যান। সেখানে তখন স্বামী বগলানন্দজী অধ্যক্ষ। বগলানন্দজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কোথায় থাকতে চান, গেস্ট হাউসে না ঠাকুরের বৈঠকখানা ঘরে। জয়রাম মহারাজ নির্দিষ্ট দ্বিতীয়টিকে বেছে নেন। তিনি জয়রাম মহারাজের জন্যে একটু রসমও তৈরী করে দেন। তাঁর এই যত্ন ও স্নেহ-ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে যান ব্রহ্মচারী জয়রাম। যাই হোক এরপর তিনি জয়রামবাটির উৎসবে যোগদান করেন। প্রায় চার হাজার প্রতিনিধি ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। তিনিও যজ্ঞকুণ্ড সাজানো, খাবার পরিবেশন করা ইত্যাদি নানা কাজে যুক্ত হয়ে যান। মূল উৎসবের দিনে প্রায় পঁচিশ হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী জয়রাম শুনতে পেয়েছিলেন যে গ্রামের বৃদ্ধারা বলাবলি করতেন, ‘আমাদের সারুর জন্যে এরা কি কাণ্ড না করছে’। এই অনন্য উৎসবে সামিল হতে পারাকে তিনি নিজের জীবনের অশেষ সৌভাগ্যের বলে মনে করতেন সারাজীবন। জয়রামবাটির আনন্দ-উৎসব শেষ করে তীর্থদর্শন-মানসে তিনি প্রথমে বারাগসি যান, সেখানে তিন-চার দিন থেকে পৌঁছান লক্ষ্মী। এখানে দুই-

তিনদিন থেকে তিনি প্রথমে যান আলমোড়া। সেখান থেকে তাঁর মায়াবতী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সম্বুদ্ধানন্দজী এইভাবে তাঁর চলে-আসাটি নাও পছন্দ করতে পারেন শুনে তিনি দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন ও আগ্রা হয়ে বোম্বে ফেরার ব্যাপারে মনস্থ করেন। হৃষিকেশ দর্শন করেন। এখানেই তিনি ডিভাইন লাইফ সোসাইটির আশ্রমে যান এবং স্বামী শিবানন্দজীর দেখা পান। তিনি তাঁকে কিছু বই উপহার দেন। বৃন্দাবনে এসে তিনি পূজনীয় সারদেশানন্দজীর দর্শন লাভ করেন। এরপর মথুরা দর্শন করে তিনি বোম্বে আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

এরপর ১৯৫৬-তে আবার তাঁকে বেলুড় মঠে আসতে হয় ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভের জন্যে। ১৯৫৬-র ১৪ই মার্চ পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে তিনি ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভ করেন, তাঁর নতুন নাম হয় ব্রহ্মচারী সম্বিতচৈতন্য। এই সময়েই তিনি পূজনীয় স্বামী প্রত্যয়ানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে যান এবং সেখানে স্বামীজীর ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তথা মহিমাবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি, কারণ স্বামীজীর জন্মস্থানের ব্যাপারে মহিমাবাবুকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি খুব বিরক্ত হয়ে বলতে থাকেন, ‘এখন সবাই কেবল এসে জিজ্ঞাসা করে স্বামীজী কোথায় জন্মেছিলেন, কোথায় এটা করেছিলেন, সেটা করেছিলেন, এইসব; আরে বাবা যাও, তাঁর লেখা পড় আর সেগুলি অনুশীলন করার চেষ্টা করো।’

১৯৫৬-তে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা যান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী। তাঁরা যখন ফিরলেন তখন তাঁদের বোম্বে এয়ারপোর্ট থেকে আশ্রমে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ে জয়রাম মহারাজের উপর। এই সময় তাঁরা দুজনেই একদিনের জন্যে বোম্বে আশ্রমে ছিলেন। সেই সময় আশ্রমে কোন পাখা ছিল না। জয়রাম মহারাজ একটি টেবিল-ফ্যান একজন পার্সি ভক্ত মহিলার কাছ থেকে নিয়ে আসেন পূজনীয় মাধবানন্দজী মহারাজের জন্যে। মাধবানন্দজী তাঁকে বলেন সেটি নির্বাণানন্দজীকে দেওয়ার জন্যে। যখন তিনি সেটি নিয়ে নির্বাণানন্দজীর কাছে যান, তখন তিনি আবার সেটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে মাধবানন্দজীকেই দিতে বলেন। এমনই ছিল তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। জয়রাম মহারাজকে তা মুগ্ধ করেছিল। যেহেতু নির্বাণানন্দজীর ঘরে কোন ফ্যান ছিল না, তাই জয়রাম মহারাজ নিজেই তাঁকে কিছুক্ষণ বাতাস করেন। এদিকে আশ্রমে রাত নয়টায় প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টা পড়ার কথা। সাধারণ সম্পাদককে কাছে পেয়ে এই সময় সাধুরা নানা সমস্যার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল। জয়রাম মহারাজ সুযোগমত মাধবানন্দজীর কাছে গিয়ে কিছুদিনের ছুটির জন্যে প্রার্থনা করেন। মাধবানন্দজী বলেন যে, ছুটি দেওয়া যাবে না, তবে তিনি যদি অন্য আশ্রমে যেতে চান (ট্রান্সফার), তাহলে তিনি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। যাই হোক এদিকে কথাবার্তায় এত দেবী হয়ে গেল যে, জয়রাম মহারাজ দেখলেন রাতের প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টা পড়ার সময় হওয়া সত্ত্বেও পূজনীয় মাধবানন্দজী তাঁর নিত্যকার সাধন-ভজনের সময়টুকু পান নি। তাই তিনি মাধবানন্দজীকে বললেন যে তিনি রাতের খাওয়ার ঘরে এনে দেবেন কিনা। উত্তরে পূজনীয় মাধবানন্দজী বলেন, ‘আমি কি এতক্ষণ ঠাকুরের কাজই করছিলাম না?’

তাঁর বোম্বে আশ্রমে থাকার পর্বেই পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এসেছিলেন। এর ফলে জয়রাম মহারাজ পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজীর কিছু সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিশেষত পূজনীয় মহারাজের চিঠিপত্র টাইপ করে

দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর কাঁধে পড়েছিল। পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজও এক সময় আশ্রমে এসেছিলেন। একদিন সকালে জয়রাম মহারাজ বাগান থেকে নিজের ঘরে ঠাকুরকে দেবেন বলে কিছু ফুল তুলছিলেন। তাঁকে দেখে পূজনীয় ভূতেশানন্দজী বললেন, ‘এই যে, তুমি দেখছি এখন ফুল তুলছো। কিন্তু ঠাকুরের ফুল তোলা হয়ে যাওয়ার পর এটা করতে হবে। ঠাকুরের ফুল তোলার আগে কখনো ফুল তুলতে নেই।’ বোম্বে আশ্রমে যোগদানের আগেই অবশ্য তিনি এই আশ্রমের একটি বাড়ি উদ্বোধন করার জন্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে দেখেছিলেন এই আশ্রমেই। বোম্বে আশ্রমের আর একটি ঐতিহ্যের কথা তিনি পরবর্তীকালেও খুব স্মরণ করতেন। এই আশ্রমে নানা উপলক্ষে অনেক বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞরা এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে পণ্ডিত নিখিল ঘোষ, উস্তাদ আহমেদ জান থিরাকা, উস্তাদ আল্লারাখা, পণ্ডিত আনোখেলাল মিশ্র, পণ্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধন, গান্ধুবাই হাঙ্গাল, ভি জি জোগ প্রভৃতিরা আশ্রমে এসে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও এখানে অন্য অনুষ্ঠানে তিনি পণ্ডিত রবিশংকর, উস্তাদ আলি আকবর খানকেও সারারাত ধরে বাজাতে শুনেছিলেন।

বোম্বে আশ্রম তাঁর সঙ্গে যোগদানের পীঠভূমি। তাই এই আশ্রমের সঙ্গে তাঁর সাধুজীবনের শৈশব-কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িত। বহু সাধু-মহাত্মার পুণ্যসঙ্গ এখানেই তিনি লাভ করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিরাট কর্মধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে তাঁর এখান থেকেই। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কর্মজীবন ত্যাগ করে ‘মুক্তসঙ্গ’ সাধুজীবনের দৃঢ় ভিত্তি তৈরী হয়েছিল তাঁর এখানেই।

১৯৫৮তে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা কেন্দ্রে পাঠালেন, প্রবন্ধ ভারত পত্রিকার সিটি-এডিটরের কার্যভার দিয়ে। বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ে তখন পূজনীয় মাধবানন্দজী সাধারণ সম্পাদক, যদিও এইসব কাজ মূলত দেখাশুনা করছেন পূজনীয় প্রভু মহারাজ। প্রভু মহারাজ কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন ম্যানেজার মহারাজ অদ্বয়ানন্দজীকে লিখে পাঠালেন, “Thy need is greater than mine. For this reason, I am sending ...to the Advaita Ashrama. Otherwise, we wanted him here (i.e. at the Headquarters).”। এই সময়েই জয়রাম মহারাজ একদিন পূজনীয় প্রভু মহারাজকে বলেন, “Maharaj, I didn’t have the opportunity to join Mysore Study Circle. The Training Centre is also closed for me.”। এর উত্তরে পূজনীয় প্রভু মহারাজ সংক্ষেপে শুধু বলেন, “Not necessary for you”। কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম তখন ছিল ওয়েলিংটন লেনের একটি চার তলা বাড়িতে। এই বাড়িতে থাকার সময় জয়রাম মহারাজের অভ্যাস ছিল সকালে ধর্মতলা স্ট্রিট, এসপ্লানেড, রেড রোড প্রভৃতি রাস্তা দিয়ে হাঁটা। ছোটবেলা থেকেই বিষ্ণুসহস্রনাম এবং ললিতাসহস্রনাম তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এই সময়েও তাই যখন তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন, তখন কণ্ঠে থাকত এই দুটি স্তোত্র। যখন অদ্বৈত আশ্রম ডিহি এণ্টালি রোডে চলে এলো, তখন তাঁর হাঁটার জায়গা ছিল পার্ক সার্কাস ময়দান। এই সময়ের দুটি ঘটনা তিনি নিজে বলেছিলেন সেবকদের। একজন ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোককে তিনি এই সময় প্রতিদিন দেখতেন হাঁটছেন হাতে জপমালা নিয়ে ভগবানের নাম করতে করতে। আর একজন ভদ্রলোকও প্রতিদিন তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন, কিন্তু কখনও কথা বলেন নি। হঠাৎ একদিন এই ভদ্রলোক জয়রাম মহারাজের কাছে এসে পৌঁছালেন এবং

হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ‘একটু সাধুসঙ্গ করা যাক’। পরে জয়রাম মহারাজ বুঝতে পারলেন যে, এই ভদ্রলোকের এমন হঠাৎ সাধুসঙ্গের ইচ্ছার কারণ ছিল আসলে তার সন্তানকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো।

পূজনীয় অনন্যানন্দজী তখন প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক। তিনি জয়রাম মহারাজকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রফ রিডিং-এর গুরুত্ব কতটা এবং কীভাবে তা করতে হবে। পূজনীয় বিমলানন্দজী মহারাজ থাকতেন গোলপার্ক। তিনি মাঝে মাঝে অদ্বৈত আশ্রমে আসতেন। একদিন তিনি জয়রাম মহারাজকে বলছেন একটু মজা করেই, ‘দেখো, মা বলতেন কারুর দোষ দেখো না। কিন্তু এখন থেকে এই প্রবুদ্ধ ভারতের কাজ করার সময় তুমি কিন্তু যত্ন করে দোষগুলি খুঁজে বার করবে, প্রেস থেকে পাঠানো প্রফশিটে থাকা ভুলগুলি তোমাকে বার করতে হবে।’ পরবর্তীকালে প্রবুদ্ধ ভারতের এই প্রফ দেখার বিষয়টি নিয়ে স্মৃতিচারণ করতেন মহারাজ। তিনি ও পূজনীয় অনন্যানন্দজী প্রফ দেখার বিষয়ে একটি সুন্দর মজার পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। প্রথমে দুজনে অর্ধেক অর্ধেক করে পুরো প্রফশিটগুলিকে ভাগ করে প্রফ দেখতেন। তারপর, একে অপরের দেখা অংশটি নিয়ে আর একবার চেক করতেন। যদি একজন আর একজনের দেখা প্রফে কিছু ভুল বার করতে পারতেন তাহলে তাঁর অ্যাকাউন্টে, যিনি ভুল করেছেন, তিনি আট আনা জমা করতেন। এইভাবে তাঁরা যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে এইগুলি দেখার চেষ্টা করতেন। তা সত্ত্বেও যে মুদ্রণরক্ষসের (প্রিন্টার্স ডেভিল) প্রভাব কখনও কখনও থাকতো না, এমন নয়। অদ্বৈত আশ্রমের তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। তিনি তখন শিবানন্দ-বাণী ইংরাজীতে অনুবাদ করছেন। সেখানে একটি জায়গায় পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী Kumbha Fair লিখতে গিয়ে Kumbha Fare লিখে ফেলেন। মজা হল, এই ভুলটি সম্পাদক মহারাজ, সহ-সম্পাদক মহারাজ এবং জয়রাম মহারাজ সবারই চোখ এড়িয়ে যায়।

এইভাবেই ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে চলে। ১৯৬০-এ জয়রাম মহারাজের ডাক আসে বেলুড় মঠ থেকে। ১৯৬০-এর ২৮এ ফেব্রুয়ারি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে পরম পূজাপদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে থেকে তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী স্মরণানন্দ। সন্ন্যাস দীক্ষার আগের দিন অনেকেই তাঁরা উপবাস করেছিলেন। একজনের শরীরে এর ফলেই হয়ত কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। খবরটি পূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে পৌঁছানো মাত্রই তিনি সবাইকে ডাকেন আর বলেন, ‘আমি কিন্তু তোমাদের মারতে চাই না।’ পরে তিনি বুঝিয়ে দেন যে যদি কারুর কিছু প্রয়োজন হয় তবে সে নিশ্চয়ই কিছু গ্রহণ করতে পারে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে। সন্ন্যাস দীক্ষার পরে পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ শঙ্করানন্দজী সকলকে কাছে ডাকেন এবং সদ্য-সন্ন্যাসদীক্ষাপ্রাপ্তদের উপদেশদান শুরু করেন এই বাক্য দিয়ে, ‘আজ তোমরা সমস্ত অহঙ্কারকে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছ।’ এই দুটি বিষয়ই পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজীর কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি নতুন সন্ন্যাসীদের নিজেও এমন কথাই বলতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুরুপ্রদত্ত নামটিও তাঁর খুব পছন্দের হয়েছিল, কারণ নিয়ত ঈশ্বর-স্মরণই তাঁর জীবনের অনবচ্ছিন্ন সাধনারূপে তিনি সারাটি জীবন পালন করে চলেছিলেন। ঐ বছরেই তাঁর জীবনে একটি অপূর্ব ঘটনা ঘটে যার কথা তিনি সেবকদের সযত্নে বলেছেন। সেবার দুর্গাপূজা ছিল ২৭ থেকে ৩০এ সেপ্টেম্বর। তিনি সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ে একটু

জুর এসেছিল। তখন ভোর ৪টে। হঠাৎ একটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি। তিনি একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। পরবর্তীকালে সেই বাড়টিকেও তিনি চিনতে পেরেছিলেন বলরাম বসুর বাড়ি হিসেবে। যখন তিনি প্রায় বেরিয়ে আসছেন, তখন দেখলেন শ্রীশ্রীমা একটি পাথরের উপর বসে আছেন আরো কয়েকজন মহিলা ভক্তদের সঙ্গে। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, যদি শ্রীশ্রীমা তাঁর চরণদুখানি বার করেন, তাহলে তিনি তাঁর মাথা সেই শ্রীচরণের উপর রেখে প্রণাম করতে পারবেন। যে মুহূর্তে তিনি এমন ভাবতে শুরু করেছেন, দেখলেন, মা তাঁর পা-দুখানি বের করেছেন ; এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটি মায়ের শ্রীচরণের উপর রেখে প্রণাম করলেন। মা-ও তাঁর মাথায় নিজের শ্রীহস্তখানি রেখে কিছু বললেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর ঘুমও ভেঙে গেল। স্বপ্নের সমস্তটি তাঁর মধ্যে চিরকাল অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে জাগরুক ছিল। তাঁর অন্তরের সমস্ত মলিনতা, দুঃখ, বেদনা কোথায় যেন এর ফলে চিরকালের জন্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আবাল্য রাজরাজেশ্বরী মায়ের ভক্তসন্তান বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা সারদার চরণতলে নিজেকে যেন এইভাবেই ভাবীকালের পথে নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েছেন। মাতৃকৃপাধ্য পূজ্য সন্ন্যাসীর এই বিগ্রহ আজ তাই অগণ্য সাধকের ধ্যানগম্য।

১৯৬০-এর ৮ই ডিসেম্বর ৫ নম্বর ডিহি এণ্টালি রোডের ঠিকানায় অদ্বৈত আশ্রমের নতুন ভবনের উদ্বোধন হলো। উদ্বোধনের সময় পূজনীয় মাধবানন্দজী মহারাজ ভূমিস্পর্শ করে প্রণাম করলে কেউ কেউ একটু হাল্কা সুরে বলে ওঠেন, ‘মহারাজ, এটি অদ্বৈত আশ্রম’। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, ‘সে তোমাদের জন্যে’। যাই হোক, ১৯৬১-র মার্চ মাসের মধ্যে নতুন ভবনে সব কিছু নিয়ে চলে আসার কাজ সম্পূর্ণ হলো। এদিকে ১৯৬১-র এপ্রিল মাসে পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজকে পাঠানো হলো মায়াবতীতে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক পূজনীয় অনন্যানন্দজী মহারাজকে সহায়তা করার জন্যে। মায়াবতীতে যাওয়ার আগে পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আসেন তাঁর গুরুদেব পরম পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীকে দর্শনের জন্যে। স্মরণানন্দজীকে দেখেই পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী বলে ওঠেন, ‘কৈ তোমাকে তো আজকাল দেখি না’। এরপর স্মরণানন্দজী মায়াবতী যাচ্ছেন শুনে তিনি তাঁদের সময়কালের কিছু স্মৃতিচারণও করেন। স্মরণানন্দজীও এই সময় মায়াবতীতে থাকার, চারিদিকে অরণ্যানী আর তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ ঘেরা হিমালয়ের কোলে দিনযাপনের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্ন তাঁর জীবনে যেন অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সফল হওয়ার পথে এসে দাঁড়ালো।

অদ্বৈত আশ্রমের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সঙ্গে তিনি বারাণসী, লক্ষ্ণৌ হয়ে টনকপুর পৌঁছালেন। পরেরদিন সকালের বাসে বসার জায়গা না পেয়ে দুপুর ১টায় অনেক বলে-কয়ে আর একটি বাসকে রাজী করিয়ে তাঁরা লোহাঘাটের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সেকালে লোহাঘাট ছিল প্রায় নির্জন একটি অঞ্চল। রাতে সেখানে নেমে তাঁরা টর্চের আলোয় মায়াবতীর দিকে হাঁটা শুরু করলেন। গম্ভীরানন্দজী মহারাজ আগে আগে চলছিলেন, তাঁর পিছনে যাচ্ছিলেন স্মরণানন্দজী মহারাজ। একটি জায়গায় পথটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। গম্ভীরানন্দজী মহারাজ সেখানে একটু দাঁড়ানোয় স্মরণানন্দজী জিজ্ঞাসা করেন যে মহারাজ কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। যাই হোক, গম্ভীরানন্দজী তখন কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে

যান, পরে অদ্বৈত আশ্রমের অন্যদের বলেছিলেন, ‘দেখো, আমি এই রাস্তা দিয়ে ১০ বছর ধরে আসছি, আর এই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করছে যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি কিনা।’ আশ্রমের অন্যান্যরা ভাবতে পারেন নি যে ঐরাব্রে তাঁরা পৌঁছাতে পারবেন। মায়াবতীর দিনগুলি তাঁর খুব ভালোই কাটতে লাগলো। নিত্যদিনের কাজের সঙ্গেই কখনো পাহাড়ি পথে হাঁটা, কখনো নানারকমের খাবার তৈরী, কখনো বাগান পরিচর্যা, কখনো ব্যাডমিন্টন খেলা, এইসবের মধ্যে দিয়ে একটা অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে সময় অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর। আশ্রমের বাগানে বড় বড় গোলাপ ফুটে থাকতো। এখানে-সেখানে প্রস্ফুটিত লাল রডোডেন্ড্রনের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। হিমালয়ের বরফ-ঘেরা দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে রাজকীয় দেওদার গাছের দল। পূজনীয় স্মরণানন্দজীর কাছে এ যেন এক দিব্য স্বর্গীয় অলোক-লোক। অবশ্যই আর একটি জিনিস ছিল এখানে যা আশ্রমিকদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। তারা পাহাড়ি জোঁকের দল। যখন-তখন গায়ে উঠে রক্ত শুষে খেত তারা। একদিনের কথা মহারাজ উল্লেখ করতেন। পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী মহারাজ সকলের সঙ্গে সদ্য প্রাতরাশ করতে বসেছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি উঠে চলে গেলেন। সবাই ভাবছেন কি হলো। একটু পরে ফিরে এসে মহারাজ জানানেন যে, একটি জোঁক তাঁর পোশাকের ভিতরে ঢুকে বসেছিল এবং রক্ত খাচ্ছিল। তাই তিনি পোশাক পাল্টাতে গিয়েছিলেন।

এখানেই একবার উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মি: সি বি গুপ্তা একটি বিরাট দল নিয়ে আসেন মায়াবতী দর্শন করতে। তিনি স্বামীজীর খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা স্বামীজী যে ঘরটিতে ১৯০১-এ এসে থেকেছিলেন সেই ঘরটি দেখবেন। সেখানে তখন পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ থাকতেন। যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। পূজনীয় স্মরণানন্দজী তাঁর বাক্সের উপরে একটি গেরুয়া কাপড় রেখে সেখানে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি রেখেছিলেন। গুপ্তাজী সেখানে ঐ ছবি দেখে তার সামনেই একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন। পরে রাতের ক্লাসে পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী স্মরণানন্দজীকে দেখিয়ে বলছেন, ‘জয়রাম, ওর ঘরে একটা মন্দির তৈরী করেছে আর গুপ্তাজী সেখানে প্রণাম করেছে।’ পূজনীয় স্মরণানন্দজী মজা করে বলতেন, ‘পরের দিন থেকে ঐ ছবিগুলি স্যুটকেসের উপরে না থেকে ভিতরে ঢুকে গেল।’

আর একবার মাঙ্কানি নামে একজন অধ্যাপক মায়াবতীতে আসেন প্রায় ১৫ দিন থাকবেন বলে। একদিন তিনি পূজনীয় স্মরণানন্দজীকে বলছেন, ‘আপনাদের গাছ-গাছালিগুলিকে যত নিরীহ মনে হয়, তারা কিন্তু ততটা নয়।’ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন কী হয়েছে?’ তখন অধ্যাপক মাঙ্কানি বলছেন, ‘আমি একটি গাছের পাতা তুলে নিয়ে গোলাম ঘরের ফুলদানিতে রাখব বলে, ওমা, সেটি আমার হাতে দংশন করলো।’ পূজনীয় মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, ‘আপনি আর কোন ভাল ফুল বা গাছের পাতা পেলেন না। আসলে এই পার্বত্য এলাকায় ওই গাছের পাতাগুলি খুবই পাওয়া যায়, ওগুলি তো বিষাক্ত বিছুটি গাছের পাতা।’

অদ্বৈত আশ্রমে দিনগুলি এভাবেই খুব আনন্দে অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু স্মরণানন্দজীর এবং আরো দুই-একজন সাধুর খুব ইচ্ছা তুষারপাত দেখবেন। তখন শীত আসছে। তাঁরা পরিকল্পনা করছেন যে, অনেকটা পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে তাঁরা বিশাং গ্রামে যাবেন। কিন্তু আশ্রমের ম্যানেজার মহারাজ মননানন্দজী বারণ করলেন, কারণ আকাশের মুখ ভার। ১৯৬১-র ১৭ই ডিসেম্বর কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ

তুষারপাত শুরু হলো। পূজনীয় স্মরণানন্দজী সেইদিনের ঘটনা স্মরণ করে বলতেন, ‘সাধুরা সবাই দুপুরের আহারে বসেছে। এমন সময় হঠাৎ আমাদের রাঁধুনি ছুটতে ছুটতে এসে বললো, বরফ গিরতা হ্যায়। আমরাও তাড়াতাড়ি আমাদের খাবার রেখেই ছুটলাম বাইরে। চারিদিক ইতিমধ্যেই বরফে ঢেকে গেছে। সাদা তুলোর মত তুষার পড়ছে। চারিদিক নিঃশব্দ। পরের সন্ধ্যা পর্যন্ত তুষারপাত চলল, অর্থাৎ প্রায় টানা তিরিশ ঘন্টা।’ পরের দিন ছিল একাদশী। সন্ধ্যাবেলায় ছিল রামনাম-সংকীর্তন। সম্পাদক মহারাজ এই তুষারপাত আর ঠাণ্ডায় খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলেন, তিনি স্মরণানন্দজীকে বললেন, ‘ভালো করে রামনাম করো, যাতে এই বরফ পড়া বন্ধ হয়।’ বস্তুত সত্যিই যখন তাঁরা রামনাম করে বেরিয়ে এসেছেন, দেখলেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আশ্রমে প্রায় ২০ ইঞ্চি বরফের আস্তরণ। চারিদিক তুষারাবৃত, এক নিঃসীম শুভ্রতায় ভরপুর। আকাশের ভরা চাঁদের উজ্জ্বল আলো তুষার-শ্বেত আবরণের উপর পড়ে এক অপূর্ব বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে। পূজনীয় মহারাজ বলতেন, সমগ্র স্থানটি যেন এক রূপকথার দেশে পরিণত হয়েছে। পরের দিন সাধুরা ব্যাডমিণ্টন কোর্টের বরফের আস্তরণ দিয়ে ৪ ফুট উচ্চতার একটি মানুষের আদল তৈরী করে ফেললেন – একটি তুষার-মানবের মূর্তি। সম্পাদক মহারাজ সেই মূর্তিতে চোখ তৈরী করে দিলেন আর মুখের উপর গৌঁফ লাগিয়ে দিলেন। এছাড়াও একটি পতাকা গুঁজে দেওয়া হল, তাতে লেখা রইল ‘ওম্ তৎ সৎ’।

যাই হোক, ইতিমধ্যে পূজনীয় অনন্যানন্দজী পূজনীয় গম্ভীরানন্দজীকে জানালেন যে, তিনি চিকিৎসার জন্যে দিল্লি যেতে চান, তাঁর পক্ষে আর প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী স্মরণানন্দজীকে তার করে জানালেন যে তিনি যেন প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার যাবতীয় কাগজ-পত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে আসেন। সেই আদেশ পেয়ে পূজনীয় স্মরণানন্দজী ১৯৬২-র ১২ই জানুয়ারি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তারপর আবার এপ্রিল মাসে নতুন সম্পাদক পূজনীয় চিদাত্মানন্দজী মহারাজকে নিয়ে ফিরে এলেন।

১৯৬৩-তে স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে মায়াবতী আশ্রমেও অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। লোহাঘাট বাজার, লোহাঘাট কলেজ, চম্পাবত তহশিল, আলমোড়া এবং পিথোরাগড়ের একটি কলেজে নানা অনুষ্ঠান হয়েছিল। অদ্বৈত আশ্রমেও একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল।

অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীন পূজনীয় স্মরণানন্দজী একটি মনে-রাখার মত ঘটনার কথা উল্লেখ করতেন। একবার পূজনীয় স্বামী চিদাত্মানন্দজী ঠিক করলেন যে তিনি, স্বামী যোগস্থানন্দজী, স্বামী স্মরণানন্দজী এবং কলকাতা থেকে আসা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এই চারজন যাবেন আশ্রম থেকে মাইল দেড়েক দূরে লোহাঘাট পয়েন্টে। আকাশে তখন মেঘ করেছে। পূজনীয় স্মরণানন্দজী নিজে একটি ছাতা নিলেন এবং সবাইকেই অনুরোধ করলেন একটি ছাতা নিতে। কিন্তু বাকীরা কেউ নিলেন না। মাঝপথে বৃষ্টি শুরু হল। তখন চিদাত্মানন্দজী ও যোগস্থানন্দজী ঠিক করলেন যে, দ্রুত আশ্রমে ফিরে গিয়ে তাঁরা ছাতা নিয়ে আসবেন। এই বলে তাঁরা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। পূজনীয় স্মরণানন্দজী ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে আশ্রমে ফিরে এলেন, কিন্তু এসে দেখেন যে চিদাত্মানন্দজী ও যোগস্থানন্দজী ফেরেন নি। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁরা

নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্রমের দুজন কর্মীকে পাঠালেন, কিন্তু তারাও একটু এদিক-ওদিক গিয়ে ও ডাকাডাকি করে ফিরে এলো। মহারাজের তখন চিন্তা বাড়তে শুরু করেছে। তখন তিনি আশ্রম হাসপাতালের কম্পাউন্ডার হায়াত সিং-কে ডেকে পাঠালেন। হায়াত সিং সব শুনে বাইরে গিয়ে চট করে পাহাড়ের মাথার উপর উঠে গেল এবং মহারাজদের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলো যে মহারাজেরা কোথায় আছেন। তারপর দুজন কর্মী ও পেট্রোম্যাক্স নিয়ে ঐ স্থানে গিয়ে মহারাজদের খুঁজে নিয়ে এলেন। পূজনীয় চিদাম্মানন্দজী পরে হায়াত সিং-কে এই কারণে পুরস্কৃত করেছিলেন।

১৯৬৩-তে পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী পূজনীয় স্মরণানন্দজীকে আবার কলকাতায় ফিরে যেতে বললেন। পূজনীয় স্মরণানন্দজী অনুরোধ জানালেন যে যদি ছুটি নিয়ে অমরনাথ এবং কেদারনাথ-বদ্রিনাথ দর্শন করতে যাওয়া যায়। পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী রাজী হলেন। পূজনীয় স্মরণানন্দজী পরবর্তীকালে তাঁর এই তীর্থদর্শনের অপূর্ব সুন্দর নিখুঁত বর্ণনাও দিয়েছেন। ১৯৬৩-র ২৪এ জুলাই পূজনীয় মহারাজ দিল্লী হয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। শ্রীনগরের নারায়ণ আশ্রমে পৌঁছে সেখান থেকে তাঁরা পহেলগাঁও হয়ে অমরনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। অমরনাথে পৌঁছে অমরগঙ্গায় স্নান করে তাঁরা প্রবেশ করেন অমরনাথজীর গুহায় এবং তুষারলিঙ্গ অমরনাথের পুণ্য দর্শন লাভ করেন। এরপর পূজনীয় মহারাজ গুহার এক কোণে বসে শিবমহিম্ন স্তোত্র পাঠ করেন। সেদিন ছিল রাখি-পূর্ণিমা তিথি। শ্রীনগরে ফিরে তাঁরা নারায়ণ আশ্রমেই ছিলেন। সেখানেই খবর পান স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে শ্রীনগরে একটি জনসভা আয়োজিত হয়েছে যেখানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রী করণ সিং। বোম্বে থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্যে এসেছেন পূজনীয় স্বামী সম্মুদ্রানন্দজী মহারাজ। যাই হোক, এরপর মহারাজেরা আবার পাঠানকোট ফিরে এসে সেখান থেকে দুই শক্তিপীঠ, কাংড়াই শ্রীশ্রীব্রজেশ্বরী এবং জ্বালামুখীতে শ্রীশ্রীজ্বালামুখীর দর্শন করেন। এরপর অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির দর্শন করে তাঁরা কনখলের দিকে অগ্রসর হন। সেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ, স্বর্ণপ্রয়াগ, গৌরীকুণ্ড হয়ে তাঁরা পৌঁছান কেদারনাথে। এরপর বদ্রিনাথ দর্শন করে তাঁরা আবার ফিরে আসেন কনখল সেবাশ্রমে। পথে অবশ্য হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা অনেকগুলি তীর্থদর্শন সেরে নিয়েছিলেন পূজনীয় মহারাজ। এরপর ১৯৬৩-র মধ্য অক্টোবরে পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ আবার পৌঁছে যান অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতায়।

কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে তখন সারা দেশ জুড়ে স্বামীজীর শতবর্ষের অনুষ্ঠান চলার জন্যেই প্রকাশনার কাজে বিপুল চাপ এসে পড়েছিল। পূজনীয় মহারাজও সেই কাজের চাপের মধ্যে এসে পড়েন। ইতিমধ্যে তাঁর ডেঙ্গু হয়। এর ফলে তাঁর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেও কিছু করার ছিল না, কাজ করতেই হচ্ছিল। শতবর্ষ অনুষ্ঠানকে ঘিরে একটি সুন্দর ঘটনার কথা পূজনীয় মহারাজ স্মরণ করতেন। পার্ক সার্কাস ময়দানে এই অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সঙ্গীত গাইবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন উক্ত ধারার বিখ্যাত গায়ক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর। তিনি মঞ্চ গাইতে উঠেই বললেন যে, ১৯৩৬-এ তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল পিতার শতবর্ষে গান করার, আর ১৯৬৩-তে তাঁর সৌভাগ্য হলো পুত্রের শতবর্ষে গান করার। এদিকে ১৯৬৩-র অক্টোবরে পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ে চলে গেলেন সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর স্থানে এলেন পূজনীয় চিদাম্মানন্দজী। এর কিছুদিন পরেই ১৯৬৬-

র ডিসেম্বরে পূজনীয় অদ্বয়ানন্দজী মহারাজ কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে যাওয়ার ফলে পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজকে অদ্বৈত আশ্রমের ম্যানেজার-এর দায়িত্ব নিতে হলো। ১৯৬৮-তে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অদ্বৈত আশ্রমের উপরে দায়িত্ব পরে এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ পরিচালনার। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে Calcutta Information Centre-এ একটি গ্রন্থ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এটি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধর্মবীর। স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লেডি রাণু মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রদর্শনীটি প্রায় এক সপ্তাহ চলে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ স্থান থেকে এটির সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ আসে বা তাদের ক্যাম্পাসে অনুরূপ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার অনুরোধও আসে। কিন্তু লোকাভাবের জন্যে তা করা সম্ভব হয় নি। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমের গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা ও তাকে ঋদ্ধ করার ব্যাপারে পূজনীয় মহারাজের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। কলকাতার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের স্টল থেকে ও অন্যান্য দোকান ঘুরে ঘুরে অনেক বই সংগ্রহ করেন তিনি।

১৯৬৮-এর ডিসেম্বর মাসে পূজনীয় অন্যান্যানন্দজীকে নিয়ে তিনি ভেলোরের খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজে যান এবং সেখান থেকেই দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু তীর্থদর্শনও করেন। এরপর ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে পূজনীয় চিদানন্দজী বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ে চলে যান সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অদ্বৈত আশ্রমের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসেন পূজনীয় স্বামী বুধানন্দজী মহারাজ। এই সময়ে বেলুড় মঠের অনেক কাজের ক্ষেত্রে অন্যান্য আশ্রমের সঙ্গে স্মরণানন্দজী যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন। যেহেতু তিনি পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সঙ্গে ছিলেন অনেকদিন, তাই অনেক আশ্রমের ক্ষেত্রেই এই সহায়তাটি তাঁকে করতে হতো। অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীনই তিনি বাংলা ভাষা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করেন। এইজন্যে তিনি বাংলার ধ্রুপদী গদ্য-সাহিত্যগুলি, বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্য খুব ভালো করে পড়াশুনা করেন। পরবর্তীকালেও এই বিষয়গুলি তাঁর যথেষ্ট মনে ছিল। আগেই তিনি তামিল ও ইংরাজী খুব ভালো করে জানতেন। নাসিক ও বোম্বেতে থাকাকালীন তিনি মারাঠী ভাষা ও হিন্দিও খুব ভালো করেই শিখে নিয়েছিলেন। ফলত একদিক থেকে পূজনীয় মহারাজ হয়ে উঠেছিলেন বহুভাষাবিদ এক সন্ধ্যাসী। ১৯৭৩-এ পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ তিন মাসের ছুটি নিয়ে একটু বিশ্রামের জন্যে আবার মায়াবতীতে আসেন। পথে তিনি বৃন্দাবন হয়ে এসেছিলেন। এই সময় এপ্রিল মাসেই মায়াবতীতে অনেক প্রবীণ সন্ধ্যাসীরা এসে উপস্থিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পরম পূজ্যপাদ সজ্জাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, পূজনীয় অভয়ানন্দজী মহারাজ (ভরত মহারাজ), পূজনীয় দয়ানন্দজী মহারাজ, পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ, পূজনীয় হিতানন্দজী মহারাজ, পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং আরো অনেকে। মায়াবতী আশ্রমের পক্ষে এই সময়কালটি ছিল তাই অভাবনীয়। যদিও পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজকে এঁদের থাকা প্রভৃতি ব্যাপারে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল সীমাহীন। একবার পূজনীয় হিতানন্দজী মহারাজ স্মরণানন্দজী মহারাজকে বলেছিলেন যে, তিনি উত্তরকাশীতে থেকেছেন,

কিন্তু তার থেকেও মায়াবতীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ উন্নততর। ১৯৭৫-এর বেশির ভাগ সময়টা পূজনীয় স্মরণানন্দজীকে মায়াবতীতেই কাটাতে হয় ২০০০০ গ্যালন জলের একটি জলাধার তৈরীর কাজে। এইবারেই কাজের ক্ষেত্রে একটি স্থানে গিয়ে তিনি চিতাবাঘের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৭৬-এ বেলুড় মঠের মূল কার্যালয় থেকে আবার ডাক এসে পৌঁছায় অন্যত্র কাজের ভার নেওয়ার জন্যে। এবারে বেলুড় মঠের পাশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ নামক বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিমুক্তানন্দজী মহারাজ। তাঁর শরীর চলে যাওয়ার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যাপারে নানা সমস্যার সূত্রপাত হয়। অনেক সম্পাদকের পরিবর্তনের পরেও এই অসামান্য প্রতিষ্ঠানটির কার্যধারায় একটি অবিচল স্থায়িত্বের অভাব সবাই সেদিন বোধ করছিলেন। সারদাপীঠের ইতিহাসের এমনই সংকটময় সন্ধিক্ষণে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ১৯৭৬-এর জুলাইয়ে। এর পরের প্রায় দেড় দশক সারদাপীঠের ইতিহাসে এক যুগান্তর-সৃজনকারী অধ্যায়, যাঁর পশ্চাতে রয়েছে এই অনাড়ম্বর, সরল, দক্ষ, অতি-উচ্চমানের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বিরল সাধনা। এই পর্বে যাঁরাই সারদাপীঠে ছিলেন, তাঁরাই সেই মণিদিপ্তিময় সময়ের কথা আনত শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন আর তাঁদের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে এই মহান সন্ন্যাসীর অতুষ্ণ জীবনের অজস্র প্রেরণাদায়ী হীরকদ্যুতি।

সারদাপীঠে তাঁর প্রথম কাজ ছিল আশ্রমিক জীবনকে ফিরিয়ে আনা। নবাগত ব্রহ্মচারীদের জন্যে যেমন শাস্ত্রের ক্লাস নিতেন তেমনি অন্য সাধুদের জন্যেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ক্লাস নিতেন। সাধুদের একসঙ্গে করার জন্যে তিনি মাসে একবার সাধু সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন সারদাপীঠে। তাঁরই উদ্যোগে সাধুরা কালীকীর্তন শুরু করেন। সারদাপীঠে একসময় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা হতো। কিন্তু একটি দুর্ঘটনার কারণে তা মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। ভক্তরা তাঁকে তা আবার চালু করার জন্যে আবেদন করেন। এরকমই এক ভক্তের এমন আবেদনের সময় তাঁর শিশুকন্যাটিও মহারাজের কাছে দাঁড়িয়েছিল। পূজনীয় মহারাজের মনে হয় যেন স্বয়ং মা জগদ্ধাত্রী এই শিশুকন্যার বেশ ধরে তাঁর কাছে এসেছে। এরপর তিনি বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পুনরায় জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন। সেই পূজা এখনো চলছে। পরবর্তীকালে সাধারণ সম্পাদক, সহ-সজ্জাধ্যক্ষ বা সজ্জাধ্যক্ষ হিসেবে থাকার সময়েও মঠে উপস্থিত থাকলে পূজনীয় মহারাজ মায়ের পূজা দর্শন করতে আসতেন। এমনকি কোভিড অতিমারীর সময়েও সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শনে পূজনীয় মহারাজের উপস্থিতি সকলের মধ্যে অপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি যখন সারদাপীঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন এই শাখাকেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পূজনীয় মহারাজ হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনিই প্রথম এর প্রোডাকশন বিভাগটিকে ঢেলে নতুন করে সাজান। শুধু তাই নয়, তাঁর উদ্যোগেই বিক্রয় কেন্দ্রটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ফলে সেখান থেকে আর্থিক আয়ের বিষয়টিও প্রশস্ত হয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আশ্রমের সার্বিক উন্নতি ঘটেছিল এর ফলে। আশ্রমের গোশালাটিকে নতুনভাবে তৈরী করে তিনি সাধুদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যামন্দির কলেজের ছাত্রসংখ্যা সেই সময় খুব ভালো ছিল না।

তাঁরই উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন নির্দেশিকা অনুসারে কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক পঠনপাঠন শুরু হয়, যার ফলে কলেজের আর্থিক পরিস্থিতিরই শুধু উন্নতি হয় নি, কলেজের স্নাতক স্তরের ছাত্র পাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছুটা সুবিধা হয়।

১৯৭৮-এ যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, সেখানে ত্রাণকার্যে তিনি তাঁর সমস্ত সাধু-ব্রহ্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময় তাঁকে এর জন্যে দিন-রাত পরিশ্রম করতে দেখা গিয়েছিল। ১৯৮০-তে বেলুড় মঠে দ্বিতীয় কনভেনশন আয়োজিত হয়। পূজনীয় স্মরণানন্দজী এই কনভেনশন কমিটির সদস্য ছিলেন, এখানে তিনি ভাষণও দিয়েছিলেন। বহু প্রতিনিধিদের থাকার আয়োজন তাঁরই নেতৃত্বে সারদাপীঠের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে হয়েছিল। এছাড়াও তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বি এড কলেজের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-এর কার্যধারার উপর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে। কলকাতা থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত মানুষদের নিয়ে এসে এই প্রদর্শনী সাজিয়েছিলেন তিনি। এটি বহু মানুষের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৭৯-তে পূজনীয় স্বামী সিদ্ধাঙ্গানন্দজীর আস্থানে পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ সিঙ্গাপুরে যান কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে। বস্তুত এটিই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। ১৯৮২-তে বেলুড় মঠের মূল কার্যালয়ের নির্দেশেই পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ আঞ্চলিক আবাসিক যুব সম্মেলনের আয়োজন করেন সারদাপীঠে। বস্তুত এটি এই ধরনের যুব সম্মেলনের মধ্যে ইতিহাসের বিচারে প্রথম। অনেক যুবক এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে নিজেদের জীবনকে স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। অনেকেই এর পরে স্বামীজীর কাজে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছিল। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এই ধরনের আয়োজনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজই ছিলেন এর পথিকৃৎ। ইতিমধ্যেই ১৯৮৩-র ১৮ই এপ্রিল তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের সদস্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৮৫-তে বেলুড় মঠে যে সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন হয়, পূজনীয় মহারাজ তার কার্যকরী সমিতিতে ছিলেন এবং সেবারেও সারদাপীঠে অনেক যুব-প্রতিনিধির থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ‘রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন’ নামে একটি অসাধারণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবারেও পূজনীয় মহারাজের নেতৃত্বে করা হয়েছিল। এটিও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৯৮৬-তে বেলুড় মঠে ছোট আকারে বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালিত হয়। পূজনীয় মহারাজকে এই অনুষ্ঠানের জন্যেও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে বলা হয়। পূজনীয় মহারাজ বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের পশ্চিম দিকের মাঠের শেষ প্রান্তে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর এই প্রদর্শনীটি তৈরী করেন। তাঁরই উদ্যোগে সারদাপীঠে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের উপর একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এর নাম ছিল ‘রামকৃষ্ণ দর্শন’। এটিও খুব উচ্চ মানের ছিল এবং অনেক গুণীজনের প্রশংসা লাভ করেছিল। আশির দশকের মাঝপর্বে পূজনীয় মহারাজের উদ্যোগে সারদাপীঠে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। গ্রামের যুবকদের জন্যে স্বনির্ভরতা আর স্বামীজীর আদর্শে সমাজসেবার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী এই প্রতিষ্ঠানই ‘সমাজ সেবক শিক্ষণমন্দির’।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়েই বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত সন্ধ্যারতির ভজনটির রেকর্ড করে তা সাধারণের জন্যে প্রকাশের অনুমতি দান করেন। পূজনীয় মহারাজ এই ব্যাপারে সারদাপীঠের

সন্ন্যাসী স্বামী সর্বগানন্দজীকে দায়িত্ব দেন এবং শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয় এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে কথামৃতের গান, রামনাম সংকীর্তন, কালীকীর্তন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ বিষয়ক সংগীত ও স্তোত্রগুলিকে একইভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে পূজনীয় মহারাজ ছিলেন অগ্রগামী পুরোহিত। আজ যে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ গীতি বা আধ্যাত্মিক ভজনসমূহ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে, আধ্যাত্মিক সাধনার নিত্যদিনের সাথী হয়ে উঠেছে এর পিছনে রয়েছে পূজনীয় মহারাজের এই অনন্য দূরদৃষ্টি। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তার উত্থান-পতনের ইতিহাস তেমনভাবে লেখা হয় না। যদি কোনদিন কোন গবেষক সেই ইতিহাসের সন্ধানে বসেন এবং পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে সেই ইতিহাসের হলুদ পাতাগুলি উল্টাতে থাকেন, তাহলে তিনি অবাক হয়ে দেখবেন কেমন করে এই নিজে-আড়ালে-রাখা এক সর্বভাগী সন্ন্যাসী একটি দেশ ও জাতির গণদেবতার মাঝে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিকতার ধারাকে গভীরভাবে বইয়ে দিয়েছিলেন, যার সোনার ফসল আজ দেদার ছড়িয়ে আছে আমাদের ঘরের দাওয়ায়, আমাদের দেব-দেউলে, আমাদের উৎসবের আঙিনায়, আমাদের জীবনের ক্লাস্তি-মোছা মানস-সাধনার নিরবধি ধ্যানমগ্নতায়।

এদিকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক এবং চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজীর মহাসমাধি লাভ ঘটে। এর ফলে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ চেন্নাই মঠের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯১-এর ১৮ই ডিসেম্বর। এখানে তিনি ১৯৯৫-এর মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। এখানেও সাধু-ভক্তদের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষতার সময়েই চেন্নাই মঠে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং তার ভিত্তিপ্তর স্থাপিত হয়। সম্ভাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এই ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন। চেন্নাইয়ে থাকাকালীন তামিলনাড়ু ব্যাপী সমস্ত ভক্তদের নিয়ে তিনি একটি বিরাট ভক্ত সম্মেলনের আয়োজন করেন। এর ফলে তামিলনাড়ুর সমস্ত গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শভিত্তিক কেন্দ্রগুলি একটি ছাতার তলায় আসার সুযোগ পায়, যা পরবর্তীকালে তামিলনাড়ুতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রভাবকে আরো বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

যাই হোক, আবার ডাক এসে পৌঁছায় বেলুড় মঠ থেকে। তাঁকে সঙ্ঘের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলা হয়। ফলত চেন্নাইয়ের দায়িত্ব পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজীর হাতে দিয়ে তিনি বেলুড় মঠ চলে আসেন এবং ১৯৯৫-এর ১৯এ এপ্রিল তিনি সহ-সম্পাদকের পদে আসীন হন। দু-বছর এই পদে আসীন থাকার পরে পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯৭-এর ২২এ মে, বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে। এই পদে তিনি দীর্ঘ ১০ বছর আসীন ছিলেন। তাঁর সাধারণ সম্পাদকের সময়কাল সঙ্ঘের ইতিহাসে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। তাঁর সময়ে মিশনের শাখাকেন্দ্র হিসেবে ভারতে নতুন ১১টি এবং বিদেশে নতুন ৪টি শাখাকেন্দ্রের সূচনা হয়। আর একটি উপকেন্দ্র (Sub-centre) তৈরী হয় বেলগাঁও-এ। এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠের অধীনে আসে ভারতে নতুন ৬টি এবং বিদেশে নতুন ৪টি শাখাকেন্দ্র। সাবসেন্টার হিসেবে গৃহীত হয় ভারতে ২টি এবং বিদেশে ৬টি। যৌথভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র হিসেবে আসে দুটি কেন্দ্র

- বরোদা এবং কাড়াপ্পা। কাড়াপ্পা অবশ্য আগে সাবসেন্টার ছিল। বলরাম মন্দির, শিকরা-কুলিনগ্রাম এবং অদ্বৈত আশ্রম আইনগতভাবে রামকৃষ্ণ মঠের পূর্ণ শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বহুদিন-লালিত স্বপ্ন সফল হয় বেলুড় মঠে পরিগণিত বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিমড় ইউনিভার্সিটি হিসেবে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্বামীজীর পৈতৃক নিবাসটিও অধিগৃহীত হয় এবং তার সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন হয়। তাঁর সময়েই ১৯৯৯-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি ভারতের রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন Gandhi Peace Award প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মিশনকে। মিশনের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন পরম পূজ্যপাদ সজ্জাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ২০০৩-এর জানুয়ারিতে UNESCO Madanjeet Singh Prize প্রদান করা হয় রামকৃষ্ণ মিশনকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে সুখ ও শান্তিমূলক নানা কার্যাবলী পরিচালনার জন্যে। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের সমাপ্তিসূচক অনুষ্ঠান তাঁর সম্পাদকত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠে দুই দিনের সর্বভারতীয় যুব-সম্মেলন ও তারপরেই দুই দিনের সর্বভারতীয় ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮-এর ৫ ও ৬ জুন ১৫টি ভাবপ্রচার পরিষদকে নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেলুড় মঠে। তাঁর সময়েই ২০০৪-২০০৫ সাল জুড়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্থশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয় বেলুড় মঠ সহ অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে।

মাদুরাই, দিনাজপুর, কিশেনপুর, মালদা, লক্ষৌ, চেন্নাই, বাগেরহাট, হবিগঞ্জ, পুনে, বেলগাঁও, ঢাকা এবং নারায়ণপুরে নতুন মন্দির উৎসর্গীকৃত হয় এই সময়পর্বেই। এছাড়াও হায়দ্রাবাদের Vivekananda Institute of Human Excellence, বরানগরের আদি মঠ, বেলুড় মঠে সংস্কৃতি ভবন, মূল কার্যালয়ের সম্প্রসারিত বাড়ি, ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন বাড়ি প্রভৃতির উদ্বোধন পূজনীয় মহারাজের সাধারণ সম্পাদক থাকার সময়েই সম্পন্ন হয়। তাঁর নেতৃত্বেই অন্ধ্রপ্রদেশ সাইক্লোন, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের ভূমিকম্প, তামিলনাড়ুর সুনামী, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার বন্যা প্রভৃতি ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন তিনি রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বহুদেশ ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের দেশগুলি, আমেরিকা, কানাডা, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, তুরস্ক, ইংল্যান্ড, রাশিয়াসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ। ভারতেও তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক শাখাকেন্দ্রে পরিদর্শন উপলক্ষে বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে পৌঁছে গিয়েছেন।

টানা এক দশক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব সামলানোর পর, পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ সহ-সজ্জাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০০৭-এর ২রা মে, বুদ্ধপূর্ণিমার তিথিতে। এরপরেই তিনি মায়াবতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে ৬ই জুন পর্যন্ত থেকে তিনি শ্যামলাতাল, কনখল, কিশেনপুর প্রভৃতি স্থান হয়ে দিল্লি আশ্রমে এসে পৌঁছান। এরপর মন্ত্রদীক্ষা দানের পর্ব শুরু হয় ২০০৭-এর ৯ই জুলাই। প্রথম তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেন কামারপুকুর মঠে। তারপরে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেন জয়রামবাটিতে। মন্ত্রদীক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পূজনীয় মহারাজ ভারত ও বিদেশের বহু শাখাকেন্দ্র এবং ভাবপ্রচার পরিষদের অধীন অনেক আশ্রমেও পৌঁছে গিয়েছেন এবং অধ্যাপ্যাপিসা ভক্তদের

মন্ত্রদীক্ষা দানে কৃতার্থ করেছেন। পরম পূজ্যপাদ পঞ্চদশ সজ্জাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজীর মহাসমাধি লাভের পর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ সজ্জাধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করেন ২০১৭-এর ২১এ জুলাই, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্বদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথির দিন। এই পর্বেরও অগণিত মানুষকে তিনি ঠাকুরের নাম বিতরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিতের সংখ্যা ছিল ৭৫০২০। সহ-সজ্জাধ্যক্ষ ও সজ্জাধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি দেশ-বিদেশের বহু স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন, মন্ত্রদীক্ষা দানের জন্যে এবং বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা আশ্রমের বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠা বা উদ্যাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এসবের মধ্যেই মায়াবতী আশ্রমে তিনি বারবার ফিরে গেছেন। জীবনের সূচনা পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে অদ্বৈত আশ্রমের ভূমি তাঁকে সাধন ও স্বাধ্যায়ের নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল, সে পবিত্র, শান্ত, দেবশুভ্র ভূমিকে কখনো ভোলেন নি তিনি। এরই সঙ্গে সাধারণ সম্পাদকত্বের সময় থেকেই অল্লাধিক, আর সহ-সজ্জাধ্যক্ষ হওয়ার পর থেকে জীবনের অন্ত্যলীলা পর্যন্ত আরো বেশী, নরেন্দ্রপুর আশ্রমেও তাঁকে একাধিকবার যেতে দেখা গেছে। এর তপোবন-সদৃশ সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশও পূজনীয় মহারাজকে খুব আকর্ষণ করতো। উন্মুক্ত পট্রে-পুষ্পে শোভিত প্রকৃতি তাঁর কাছে ঈশ্বরের আরাধনার উপযুক্ত ভূমি বলে স্বীকৃত হয়েছে বারবার। তাই আমরা দেখেছি যে সব আশ্রমেই তিনি বাগানের পরিচর্যার দিকে নিজে খুব নজর দিতেন, সঙ্গের সাধু-ব্রহ্মচারীদেরও উৎসাহিত করতেন। সজ্জের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেছেন যে, যখন তিনি মালদা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন, তখন মহারাজ তাঁকে সেখানে ভালো ফুলবাগান করার জন্যে নির্দেশ দেন এবং বলে দেন যে এর ফলে আশ্রমের ভাবটিও সুন্দর হবে।

সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবন-গঠনের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর থাকতো। নিজের জীবনে জপধ্যান, স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ে যে নিয়মানুবর্তিতার আদর্শ তৈরী করেছিলেন, সেগুলিই যেন অন্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনে আসে, সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নিজের জীবনটি ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে কোন বিশেষ কিছুই পছন্দ ছিল না তাঁর। যখন তিনি সারদাপীঠে আছেন তখন একজন যুবক এসে সজ্জ যোগদান করেছেন। বিকেলে চা খেয়ে তিনি সেই সদ্য সজ্জ যোগদান করা ব্রহ্মচারীটিকে নিয়ে হাঁটতে বেরোলেন। বললেন যে তিনি তাঁকে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং এখানে যেসব সাধু-ব্রহ্মচারীরা আছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে দেবেন। এই পরিসরেই হাঁটতে হাঁটতে তিনি কিন্তু ব্রহ্মচারীটির কাছ থেকে তার সম্পর্কিত সব খবর নিয়ে নিলেন। এইভাবে এক-একটি বিভাগে তিনি যাচ্ছেন, সেখানকার সম্পর্কে বলছেন আর সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম দিনেই ব্রহ্মচারীটির মনে দাগ কেটে যাচ্ছে এই বিরাট সেবাযন্ত্রের সম্পর্কে আবার আপন বোধ সৃষ্টি হচ্ছে এখানকার আশ্রমিকদের সঙ্গেও। সেই নবাগত ব্রহ্মচারীটি একদিন খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তার জুতোজোড়া কোথায়? নবাগত ব্রহ্মচারীটি জানায় যে, মন্দির থেকে সেটি চুরি হয়ে গিয়েছে। পূজনীয় মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কাজ করেন আর একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন যে দ্যাখো, এ জানে না যে চোররাও মন্দিরে আসে, তবে নিজেদের জীবিকা সংস্থানের জন্যে। যাই হোক, উক্ত ব্রহ্মচারীকে নির্দেশ দিলেন একটি জুতোজোড়া সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে কিনে দেওয়ার জন্যে। নবাগত এক

ব্রহ্মচারী পূজার ঘরে একদিন পানিফল আর শাঁকালু কাটতে পারছে না। পূজনীয় মহারাজ নিজে বাঁটি নিয়ে বসে গেলেন, এবং ধীরে ধীরে দেখিয়ে দিলেন কেমন করে তা করতে হবে। এক অপূর্ব নিরভিমান, সদা-সহৃদয় জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। যখনই কোথাও যেতেন, বিশেষত কামারপুকুর, জয়রামবাটি বা কোন শাখাকেন্দ্রে তখনই সঙ্গে নিয়ে যেতেন একজন-দুজন ব্রহ্মচারীকে। তারাও তাঁর এই সঙ্গলাভের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকত। ট্রাস্টি মিটিং থাকলেও কোনদিন তিনি ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারীদের ক্লাস বাদ দিতেন না। সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীনও এই ক্লাস তিনি নিয়মিত নিয়ে গেছেন। যারা এই ক্লাস করেছে, তারা সকলেই স্মৃতিচারণ করে বলে যে, কঠিন বিষয়কে সহজ করে বোঝানোর এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতি সত্যিই ছিল বিরল। ক্লাসের ফাঁকেই কত মজার গল্প হতো, কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতেন তিনি সকলের সঙ্গে। এক দুর্লভ স্মৃতিশক্তি আর অপূর্ব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল তাঁর, সঙ্গে ছিল বর্ণনা করার অননুकरणीয় দক্ষতা।

প্রতিদিন সকালে তিনি জপধ্যানের ঘরে নিজেও যেতেন এবং দেখতেন কেউ জপধ্যানে অনুপস্থিত আছে কিনা। যদি দেখতেন কেউ আসে নি, তাহলে পরে সকালে ধীরে ধীরে তার ঘরে গিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করতেন যে, তার শরীর ভালো আছে কিনা, কেন সে মন্দিরে যেতে পারে নি ইত্যাদি। প্রতিদিন কথামৃত ও গীতা পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, তাঁরা সকলে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ব্রহ্মচারীদের প্রতিদিন গীতার কয়েকটি শ্লোক মুখস্থ বলতে হতো। তিনি শুনে তাদের উচ্চারণ ঠিক করে দিতেন। গীতা তাঁরও কণ্ঠস্থ ছিল, ফলে নিজে কোনদিন বই দেখেন নি। তাঁর কাছে যারা থাকত, তাদের প্রায় প্রত্যেকের গীতা ছিল কণ্ঠস্থ।

তাঁদের সঙ্গে পূজনীয় মহারাজের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। একবার যখন তিনি সারদাপীঠে আছেন, তখন একজন সাধুকে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কলকাতার উপকণ্ঠে একটি কেন্দ্রে বদলি করেছেন। সাধুটির এতে মন খারাপ, কারণ তাকে পূজনীয় মহারাজকে ছেড়ে যেতে হবে। পূজনীয় মহারাজকে সেই খবর দিলে পূজনীয় মহারাজও তাঁকে জানান যে তাঁরও এজন্যে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেমন বলেছেন তেমনই তো করতে হবে। একদিকে সজ্জের প্রতি কুণ্ঠাহীন দায়বদ্ধতা, অপরদিকে সাধুভাইদের প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা। পূজনীয় মহারাজের সারাটি জীবনে এমন দৃষ্টান্ত ভূয়ো ছড়িয়ে আছে।

যে আশ্রমে থাকতেন সেখানকার কর্মীদের প্রতিও তাঁর সযত্ন দৃষ্টি ছিল। যখন তিনি সারদাপীঠে, তখন কর্মীদের বেতনসংস্কার করেছেন। একজন পুরানো কর্মীর বিশেষ অসুস্থতা ছিল জেনে তাঁর চিকিৎসার দিকে সবসময় দৃষ্টি রাখতেন।

সেবাকাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহ ছিল আদর্শস্বরূপ। সংশোধনাগারে কাজ করতেন এমন একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জানিয়েছেন যে, পূজনীয় মহারাজ একবার তাঁর সঙ্গে সংশোধনাগারের কাজ দেখতেও গিয়েছিলেন এবং সেখানকার আবাসিকদের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। একবার বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজের এন এস এস ইউনিট ও খড়গপুর আই আই টি-র এন এস এস ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ দূষণের উপর একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। পূজনীয় মহারাজ তখন সারদাপীঠের সম্পাদক। ওই আলোচনাচক্রে তিনি ‘মানবচরিত্র দূষণ ও তার প্রতিরোধে এন এস এস-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য’ বিষয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন।

সত্যকে ধরে রাখা, অকপটতা প্রভৃতির কঠোর অনুশীলন তাঁর সমগ্র জীবনকে এক ভিন্ন উচ্চতায় স্থাপন করেছে। আশ্রমে আগত ভক্ত বা দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করতেন, কথা বলতেন, কিন্তু কখনো তাতে কোন অতিরিক্ত সময় নষ্ট করতেন না। খুব দ্রুত যে কোন সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করে তার উৎস ও সমাধান বের করে ফেলার এক অসামান্য দক্ষতা ছিল মহারাজের সহজাত। তাঁর টেবিলে কখনোই ফাইল জমে থাকত না। হিসাব-নিকাশের স্বচ্ছতা রাখার ব্যাপারে তাঁর কড়া নজর ছিল এবং এই ক্ষেত্রে খুব সুন্দর নিয়মাবলীও তিনি তৈরী করে দিয়েছিলেন। দুই হাতের চারটি মাত্র আঙুল ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুত টাইপ করতে পারতেন মহারাজ। সারদাপীঠে যখন প্রথম আসেন মহারাজ তখন অফিসে তাঁকে সাহায্য করার কোন লোক ছিল না, পূজনীয় মহারাজ নিজেই টাইপ করতেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দ্রুত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও ছিল তাঁর। বিষয়ের গভীরে ঢুকতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই কাজের চাপে নিজের আন্তরিক অমায়িকতাকে নষ্ট হতে দেন নি। একবার আলোচনা ওঠে যে তামিলনাড়ুর এলাগিরি আশ্রমের জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে যেহেতু তা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তখন পূজনীয় মহারাজ চেম্বাই মঠের অধ্যক্ষ। তিনি নিজে একজন সাধুভাইকে নিয়ে এলাগিরি পৌঁছে যান, সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে। ১০ দিন প্রায় সেখানে ছিলেন তিনি। তখন সেখানে আলো বা জলের ব্যবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু মহারাজ তা সত্ত্বেও সেখানে থাকেন। ওই অঞ্চলের অপূর্ব নির্জনতা ও এক সাধারণ অথচ উন্নত আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাহাত্ম্য নিজে অনুভব করেন এবং এই সম্পত্তি না বিক্রি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে কত দূরদৃষ্টি ছিল মহারাজের। আজ এলাগিরি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি শাখাকেন্দ্র।

কঠোর সততা তাঁর জীবনকে ঘিরে যেন আবর্তিত হতো। ছোট-বড় নানা ঘটনার মধ্যে এর পরিচয় সকলেই লাভ করতো। একবার পূজনীয় মহারাজ সারদাপীঠ থেকে আশ্রমে গাড়িতে চড়ে আর এক সন্ন্যাসীকে নিয়ে কোন কাজে কলকাতার দিকে যাচ্ছেন। ডানলপ ব্রিজের কাছে ট্রাফিক জ্যাম। কম বয়সী অতি-উৎসাহী গাড়িচালক হঠাৎ একটি লাল কাপড় বের করে অ্যান্ডুলেসের মত সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করে চলেছে। সঙ্গের সন্ন্যাসী মহারাজ পূজনীয় মহারাজের দৃষ্টি বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ করলে মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গাড়িচালককে বললেন যে, সে যদি ঐভাবে করে তাহলে তাঁরা সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাঁকে তিরস্কার করে বললেন কখনো এরকম মিথ্যা আচরণ সে যেন না করে, কারণ চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না।

পূজনীয় মহারাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সরল, অমায়িক, রসিক ব্যবহার। কোন অহঙ্কারের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যেত না তাঁর আচরণে। সারদাপীঠে যখন পূজনীয় মহারাজ ছিলেন, তখন তাঁর শরীর ছিল মেদহীন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় তদানীন্তন এক পুলিশ সুপার এসেছেন আশ্রমে। পূজনীয় মহারাজ এবং আর একজন সন্ন্যাসী আছেন যিনি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান। পুলিশ সুপার ভদ্রলোক যখনই কথা বলছেন, তখনই এই স্বাস্থ্যবান সন্ন্যাসীটির দিকে তাকিয়েই কথা বলে চলেছেন। বয়সে তরুণ সেই স্বাস্থ্যবান সন্ন্যাসী পুলিশ-সুপারকে বললেন যে তিনি সেক্রেটারি নন, পূজনীয় মহারাজই সেক্রেটারি। তখন একবার পুলিশ সুপার বলে উঠলেন, ‘আহা পূর্বে বলবেন তো মহারাজ, ওনাকে তো সেক্রেটারি বলে মনেই হচ্ছে না।’ সেই থেকে পূজনীয় মহারাজ রসিকতা করে ঐ স্বাস্থ্যবান তখনকার কালের তরুণ

সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়ে বলতেন যে উনি পাশে থাকলে পূজনীয় মহারাজকে কেউ সেক্রেটারি হিসেবে মানতে চায় না।

সঙ্ঘের পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজ স্বামী সুবীরানন্দজী বলেছেন যে যখন তিনি প্রি-প্রবেশনার ব্রহ্মচারী তখন অদ্বৈত আশ্রমে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পূজনীয় মহারাজ তখন এখানকার ম্যানেজার। কিন্তু পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজের সরল, অমায়িক, নিরহংকার ব্যবহারে তাঁর মনের সব ভয়-ভীতি চলে গিয়েছিল, তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে দেখে। পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, ‘যখন আমি (পূজনীয় স্বামী সুবীরানন্দজী) সাধারণ সম্পাদক হলাম, তার অল্পদিনের মধ্যেই পরম পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ সজ্জাধ্যক্ষ পদে বৃত্ত হন। এই কয়েক বছর যখন কোন সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনার জন্যে গেছি, পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ আমাকে উপযুক্ত সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সঙ্ঘের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও একাত্মতাবোধ। যখন তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে নরেন্দ্রপুরে গেলেন, একদিন আমি সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মহারাজ কেমন আছেন? মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, ‘I am getting well, slowly.’ ভেবেছিলাম, তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু সে আর হল না। আমাদের সজ্জাধ্যক্ষরা ঠাকুরের প্রতিনিধি-প্রতিমা। পূজনীয় মহারাজও তাই ছিলেন।’

যখন তিনি সারদাপীঠে ছিলেন তখন বিদ্যামন্দিরের একজন হস্টেল-অধীক্ষক সন্ন্যাসী প্রায় প্রতিদিনই তাঁর কাছে এসে একটি করে সমস্যা বলে জানতে চাইতেন কি করা উচিত। পূজনীয় মহারাজও তাঁকে হেসে হেসে উত্তর দিতেন। একদিন সেই সন্ন্যাসী মহারাজ এসে বললেন যে সেদিন তাঁর কাছে কোন সমস্যা নেই। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য উত্তর, এটাই একটা বড় সমস্যা যে আজ উক্ত সন্ন্যাসীর কোন সমস্যা নেই।

এই রসিকতার মনটি তাঁর শেষ পর্যন্ত জেগে ছিল। অনেক মজার মজার গল্প বলতেন তিনি। এরকমই একটি গল্প ছিল, ‘We know what it is but we do not where it is’। একবার বেলুড় মঠের একটি মিটিং-এ এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁকে এই লাইনটি মনে করিয়ে দিয়ে গল্পটি তাঁর মনে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে, মনে আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সব জায়গায় তা বলা যাবে না। এরকম একটি গল্প এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক গুরুদেব ও তাঁর শিষ্য ভাণ্ডারায় গেছে। ভাণ্ডারার আহারাদির পরিমাণ একটু বেশিই হয়েছে। যার ফলে, মুখটি আর নামাতে পারছেন না তাঁরা। ফলে গুরুদেব নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি তখন শিষ্যকে বলছেন, ‘হে শিষ্য আমার পাদরক্ষা কোথায়?’ অর্থাৎ আমার পাদুকাটি কোথায়। শিষ্যেরও প্রায় একই অবস্থা। শিষ্যও মুখ নামাতে পারছেন না। তাই তাঁর উত্তর, ‘গুরুদেব, আমি সারা আকাশ খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও আপনার পাদরক্ষার সন্ধান পেলাম না।’

শেষ দিকে পূজনীয় মহারাজের প্রতিদিনকার কাজের একটি ছিল রাত আটটার দিকে একটু হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটু থামতেন, আবার হাঁটতেন। পূজনীয় মহারাজের হাতে একটি লাঠি থাকতো। যাই হোক, এরকম হাঁটতে হাঁটতে তিনি একদিন সিঁড়ির কাছে পৌঁছেছেন। একজন সেবক সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তাঁকে সামনে দেখে সেবক একটু থামলেন। সেবক একটু মজা করে বললেন, ‘গৃহীত্বা দণ্ডং’। প্রথম দুটি শব্দ – ‘বৃদ্ধো যাতি’ – বললেন না। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে

শান্তভাবে উত্তর, ‘তদপি ন মুঞ্চতি আশাপিণ্ডং’। আর একবার এক সেবক পূজনীয় মহারাজকে বলছেন, ‘মহারাজ আপনি তো ইতিহাস তৈরী করেছেন’। পূজনীয় মহারাজের প্রশ্ন, ‘কিরকম?’ সেবক বললেন, ‘আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য হয়েছিলেন’। সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় মহারাজের একটু হেসে উত্তর, ‘ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার’। একবার পূজনীয় মহারাজের প্রণাম পর্ব চলছে। এক ব্রক্ষচারী তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছে, সেও প্রণামের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাম তুষার। সে কাছে আসতেই, সেবক পূজনীয় মহারাজকে ঐ ব্রক্ষচারীকে দেখিয়ে বলছেন, ‘মহারাজ, এই যে তুষার’। পূজনীয় মহারাজের তৎক্ষণাৎ উত্তর, ‘ও, আমার তাই এত ঠাণ্ডা লাগছে’।

একদিন পূজনীয় মহারাজ শুয়ে আছেন, পিঠটা একটু চুলকাচ্ছে। সেবককে ডাকলেন। সেবক পিঠ চুলকে দিয়ে বললেন, ‘কানে একটু ড্রপ দিয়ে দিই, তাহলে কানের ওয়াক্সগুলি নরম হয়ে যাবে।’ ড্রপ দিয়ে সেবক একটুক্ষণ ধরে আছেন, কারণ তখন ওঠা যাবে না; পূজনীয় মহারাজ বলছেন, ‘দুই টাকা দিয়ে নাচতে বলে দশ টাকা দিয়ে থামাতে হবে, হয় কি অবস্থা আমার!’

সেবকরা হুইল চেয়ারে করে তাঁকে মন্দিরে প্রণাম করতে নিয়ে যাচ্ছে। একটু গিয়ে একজন সেবক জিজ্ঞাসা করছেন, ‘মহারাজ আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো?’ পূজনীয় মহারাজের উত্তর, ‘যারা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের তো বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা’। সেবক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার অসুবিধা হচ্ছে কিনা বলুন’। পূজনীয় মহারাজের সরস উত্তর, ‘আমি তো বসেই আছি’।

সারদাপীঠে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই মহান সন্ন্যাসীর নানান গুণাবলীর মুগ্ধ বর্ণনাকার। কেউ তাঁকে বর্ণনা করেছেন প্রভাতের নীরব শিশির কণার সঙ্গে, যা সবার চোখের আড়ালেই এসে পড়ে মাটির উপর, অথচ স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে চারিদিককে। কারুর কাছে সেই সময়ের আখ্যান যেন এক স্বর্ণিম সময়ের অভিজ্ঞতা। কেউ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এক স্নেহশীল পিতা, বন্ধু ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশককে।

সজ্জাধ্যক্ষ হিসেবে সর্বদাই তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীররূপী এই সজ্জ। ২০২২-এর ডিসেম্বর মাস। সুদূর অরুণাচল প্রদেশে সদ্য-গৃহীত ও নির্মীয়মান এক শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষকে সেবকের মারফৎ ফোন করলেন পূজনীয় মহারাজ। জানতে চাইলেন নতুন কেন্দ্রের কাজকর্ম কেমন হচ্ছে। শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক জানালেন যে, তখনো পর্যন্ত সব ঠিকই চলছে, কিন্তু টাকা যদি সরকারের পক্ষ থেকে না আসে তাহলে সমস্যা হবে। পূজনীয় মহারাজ বললেন, ‘সেটাই খোঁজ নিচ্ছিলাম’। পরের দিনই ওই শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক জানতে পারলেন যে পাঁচ কোটি টাকা সরকার থেকে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্যে বিশেষ কিছু শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক সম্পাদক অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে অবশেষে সেই সমস্যার জট কাটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঐ শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক শুধু বিস্ময়ে ভেবেছেন দূর বেলেড় মঠে বসে আগাম এই সমস্যার কথা পূজনীয় মহারাজ জানতে পারলেন কিভাবে!

২০২১ সালে যখন পৃথিবী জুড়ে কোভিড অতিমারী জাঁকিয়ে বসেছে, তখন বিদেশের এক শাখাকেন্দ্রের প্রবীণ এক সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজের কাছে আবেদন জানান যে, তিনি যেন মানবজাতির এই দুঃসময়ে অগণিত ভক্ত-সাধারণের জন্যে একটু কিছু আশীর্বাণী প্রদান করেন। পূজনীয় মহারাজ সেই প্রার্থনা রক্ষা করেছিলেন।

নিজেকে আড়ালে রেখে চলা – এটিও পূজনীয় মহারাজের জীবনের একটি অসাধারণত্ব। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক। একজন সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁকে নিয়ে চলেছেন মেদিনীপুর। এই সন্ন্যাসী মহারাজ কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বলে দিয়েছিলেন যে যদি পূজনীয় মহারাজের জন্যে একটি এসকট গাড়ি পাওয়া যায়, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। পূজনীয় মহারাজকে এই কথা জানানো মাত্র তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘খবরদার এই সব কোরো না।’ সপ্তের সন্ন্যাসীটিও সেটি মেনে নিয়ে পুলিশ কমিশনারকে ব্যবস্থা না করার কথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনার কোন কারণে বিষয়টি সমস্ত অঞ্চলকে জানিয়ে দিতে ভুলে যান। ফলত দেখা যায় যেই মহারাজদের গাড়ি বোম্বে রোডে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের এসকট গাড়ি আগে আগে চলতে শুরু করলো। পূজনীয় মহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেলেন। শেষে কোলাঘাতে গিয়ে তাদের নিবৃত্ত করা গেলে পূজনীয় মহারাজ আবার কথা বলা শুরু করলেন। সারদাপীঠে থাকাকালীন যেসব ক্যাসেট তথা গানের রেকর্ডিং বেরিয়েছিল, তার জন্যে পূজনীয় মহারাজ খুব পরিশ্রম করতেন। রিহাসাল এবং রেকর্ডিং-এর সময় নিজে পুরোটাই উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কোথাও নিজের নাম লিখতে দেন নি। কেবল ‘সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ’ – এইটুকুই লেখা থাকতো।

তিনি যে শুধু গানের রেকর্ডিং করিয়েছিলেন বা তার প্রকাশনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, এটিই শেষ কথা নয়, গানের খুব ভালো সমঝদার ছিলেন তিনি। গান শুনতেন, যারা গান গাইতেন, তাদের ডেকে গানের আলোচনা করতেন। গানের রাগ-রাগিণী সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। একবার বহুরাগ-সমন্বিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি অসাধারণ রেকর্ড পূজনীয় মহারাজের কাছে কেউ দিয়ে যায়। তিনি নিজে সেটি শোনেন এবং খুব আনন্দ পান, শুধু তাই নয়, অনুরূপ এক সমঝদার সাধুকে ডেকে সেটি শোনান, সেটি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং একটি কপি করে সেটি ঐ সাধুটিকে পাঠিয়েও দেন। একবার দুর্গাপূজায় ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এক ব্রহ্মচারী সকালে প্রতিদিন মঙ্গলারতির পরে ধ্রুপদী সঙ্গীত মায়ের সামনে পরিবেশন করেছিলেন। পূজনীয় মহারাজ তখন সহ-সজ্জাধ্যক্ষ। বিজয়া দশমীর পরের দিন তিনি সেই ব্রহ্মচারীটিকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং একে একে বলে যান যে কোনদিন সে কোন্ রাগে গান গেয়েছে। পরে তাকে খুব উৎসাহিতও করেন। আর একবার ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত নতুন ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁদের গান গাইতে বলেন। ব্রহ্মচারী মহারাজেরা গান ধরলেন, ‘জয় জয় রামকৃষ্ণ হরি’। ইমন কল্যাণ রাগে মারারি অভঙ্গ কীর্তনের মত করে গান শুরু হলো। দেখতে দেখতে পূজনীয় মহারাজের মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হতে লাগলো। সবাই অবাক হয়ে দেখলো, এক দিব্য আভাষ ও আনন্দে পূজনীয় মহারাজের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

যখন তিনি সাধারণ সম্পাদক, তখন অনেক সময় দেখা যেত যে সন্ধ্যারতির পর পূজনীয় মহারাজ পায়চারি করছেন, সঙ্গে কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী বা ভক্ত বা নেপালি দারোয়ানটি। একেবারেই ইনফর্ম্যাল। ক্রিকেট খেলা খুব ভালোবাসতেন। বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিজে বসে দেখতেন সকলের সঙ্গে, এমনকি তা নিয়েও আলোচনাতেও মেতে উঠতেন। তাঁর সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীনই এক সন্ন্যাসী প্রধান কার্যালয় থেকে ব্রাজিলে যাচ্ছেন সেখানকার সদ্য-অধিগৃহীত শাখাকেন্দ্রে। অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে সেই সাধুকে ছাড়বার জন্যে তিনি নিজে এয়ারপোর্ট যান। একবার এমনভাবেই

সানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের পূজনীয় প্রবুদ্ধানন্দজীকে রিসিভ করতে নিজেই চলে যান এয়ারপোর্টে। কোন বয়স, পদমর্যাদার ভার তাঁকে ক্লান্ত করে নি কখনো, অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় নি কখনো। সকলকে আপন করে নিতেন তিনি অন্যায়সে এই অনাড়ম্বর সরলতার বিরল এক ঐশ্বর্যে। পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ উল্লেখ করেছেন, ‘Swami Smarananandaji Maharaj was a silent but tireless worker. He was very simple and humble by nature. Though he has struggled and done great works, he never used to mention those to anyone.’

পূজনীয় মহারাজের উৎসাহ ও প্রেরণায় দুটি অসামান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৬৭ সালে অদ্বৈত আশ্রমের হলে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের জন্ম হয়। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের যে আত্মঘাতী ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনমুখীনতা বাংলার যুবকদের দিশাহীনতায় ঠেলে দিয়েছিল, পূজনীয় মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে বসে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলোচনায় তারই এক প্রতিস্পর্ধী অথচ ইতিবাচক, জীবন-জাগানিয়া আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিলেন। কিন্তু একই রকম নীরবে, শিশিরসম্পাতের মতই শান্ততায়। স্বামীজীর আদর্শে তৈরী হওয়া এই মহামণ্ডলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পেরিয়ে-যাওয়া সময় প্রমাণ করেছে সকলের চোখের আড়ালে অনাড়ম্বরভাবে জেগে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান, এই ভাবপ্রবাহ কত বেশী স্থায়ী আর কত বেশী শক্তিপ্রদ। সমকালের ঝঞ্ঝামুগ্ধ বাতায়নপথে বসে পূজনীয় মহারাজ যেন দূরকালের দিকে তাকিয়ে তৈরী করেছিলেন যুবকদের দিশা দেখানোর একটি পথ। সে পথ আজও অগ্রসরমান।

পূজনীয় মহারাজের অনুপ্রেরণাতেই আটের দশকের প্রথম পর্বে পথচলা শুরু করেন আর একটি প্রতিষ্ঠান ‘বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা’। পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ, নির্দেশ ও প্রেরণাকে সম্বল করে এই প্রতিষ্ঠানের কাজও আজ দূরপ্রসারী। অনেক চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বৈচ্ছাসেবক এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে চলেছেন স্বামীজীর আদর্শকে পাথেয় করে।

দুটি বই লিখেছেন পূজনীয় মহারাজ। বাংলায় ‘স্মৃতি-স্মরণ-অনুধ্যান’ আর ‘চিন্তন-মনন-অনুশীলন’। ইংরাজীতে একটি বই লিখেছিলেন, ‘Musings of a Monk’।

কিন্তু এহো বাহ্য। পূজনীয় মহারাজের এ সমস্ত কিছুই অন্তরালে জেগে ছিল এক অপূর্ব দিব্য আধ্যাত্মিক জীবন – নিজের অনুভবে, ব্যাখ্যানে, অন্যকে পথ নির্দেশদানে সেই জীবনের মণিমাঞ্জুষা ছড়িয়ে আছে থরে-বিথরে। সে বিপুল ক্ষেত্র হয়ত এই ক্ষুদ্র-কলেবর গ্রন্থে বর্ণনা করা যাবে না, অথবা হয়ত একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে অনেকেই সেই সব স্মৃতি আগলে রাখবেন চিরকাল, যেমনটি ভালোবাসতেন পূজনীয় মহারাজ নিজে। একবার এলাহাবাদ কেন্দ্রে তিনি গেছেন, সাল ১৯৭১। পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের উৎসবকে কেন্দ্র করেই তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। উৎসবের পরের দিন, তাঁরা কয়েকজন নৌকা করে ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ পূজনীয় মহারাজের চোখের সামনে ভেসে উঠলেন মুরলী-মনোহর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কথা থেমে গেছে তাঁর, চোখ দিয়ে ঝড়ে পড়ছে অশ্রুধারা। পরবর্তীকালে এই দর্শনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এর ফলেই ভাগবতের ঘটনার উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে গেল। বাঁশী হাতে ভগবানের সে কি দিব্য রূপ!’ ১৯৮২-র জানুয়ারিতে একরাত্রি ছিলেন ওঙ্কারেশ্বরে। নর্মদার উপরে একটি পাথরে বসে ধ্যান করছেন,

চোখের সামনে দেখা দিলেন দেবী নর্মদা। পরের দিন খাওয়ার ঘরে গিয়ে দেবীর সেই একই রূপ দেখলেন দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিটিতে। অধুনা ছত্তিশগড়ের দন্তেওয়াড়াতে দন্তেশ্বরী যাওয়ার সময়ও এমন দেবীদর্শন ঘটেছিল তাঁর। একবার রাজরাজেশ্বরী মাকেও স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন পূজনীয় মহারাজ। একবার সেবক ভোররাত তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ শুনতে পাচ্ছেন মহারাজের কাছ থেকে শব্দ আসছে। সকালে জিজ্ঞাসা করায় বললেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের কথা। দুপুরে আবার জিজ্ঞাসা করায়, আবার বললেন, ‘হ্যাঁ, কখনো কখনো আমি মায়ের দর্শন পাই, কিন্তু আমি তোমাদের বলি না, তুমি কিন্তু কাউকে বলবে না’।

একজন সাধু প্রশ্ন করছেন তাঁকে, ‘মহারাজ জগৎ মিথ্যা মানে কী?’ মহারাজের উত্তর, ‘এর মানে জগৎ অনিত্য, অলীক নয়।’ তখন শরীরে কিছু অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। বেলুড় মঠে আছেন। স্বামীজীর তিথিপূজা হয়ে গেছে। স্বামীজীর মন্দির থেকে সমস্ত সাজ-সজ্জাদি খুলে নেওয়া হচ্ছে। দেখে পূজনীয় মহারাজ বলছেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলে যাচ্ছে। কিন্তু মূল মন্দির যেমন থেকে যাচ্ছে, তেমনই ভিতরের যে চৈতন্যসত্তা তা কিন্তু থেকে যাচ্ছে – অপরিবর্তনীয়।

আর একবার একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘মহারাজ আপনি সাধারণ সম্পাদকের এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আর আপনি নিজেই একবার বলেছিলেন যে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু আপনাকে দেখছি যেন সবসময় অত্যন্ত হাসিখুশিভাবেই আছেন, কোন বিশেষ চাপ যেন নেই, এর ভিতরের রহস্যটা কী?’ পূজনীয় মহারাজ তাঁর সহজ অনাড়ম্বর ভঙ্গিমায় হেসে উত্তর দিলেন তাঁকে, ‘দ্যাখো দুটি বিষয় সবসময় মনে রেখো। এক জগৎটা অনিত্য, পরিবর্তনশীল। আর দুই, এটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণেরই সঙ্ঘ। তিনি নিজে এটি তৈরী করেছেন, মা, স্বামীজী ও অন্যান্য পার্শ্বদেবের দিয়ে একে লালন পালন করেছেন। আমাদের অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল আমাদের যেটুকু করার সেটুকু যেন আমরা নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে করে যেতে পারি। নিজেকে সবসময় জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি কি আমার সেরাটা শ্রীরামকৃষ্ণকে দিতে পারছি? যদি শরীর ও মন বলে, হ্যাঁ, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। মনে রেখো তাঁর কাজ করার জন্যে তাঁর আমাদেরকে প্রয়োজন নেই, আমাদেরই নিজেদের জন্যে তাঁকে দারুণভাবে প্রয়োজন আছে।’ নিজেই তিনি তাঁর কাছের সাধু-ভাইদের বলতেন যে দুটি জিনিসের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন : এক, বৈদান্তিক স্মরণ-মনন অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সত্য আর বাকী সব মিথ্যা ; আর দুই, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এক্ষেত্রে তাঁর যেন কোথাও কোন অতিরিক্ততা ছিল না। সবই ছিল সাধারণ অথচ স্বতঃস্ফূর্ত, অনাড়ম্বর অথচ সহজাত। নিজেই তিনি লিখেছেন তাঁর একটি গ্রন্থে, ‘Some lines from a sonnet by Cardinal Newman come to my mind. He says, I do not ask to see the distant scene ; one step enough for me. I did not understand the meaning when as a boy I read these lines. But they were in my memory. Many years later when I had joined the Order, I happened to be climbing a mountain in India and suddenly a big fog came, and covered up everything. If you fall you may fall a thousand feet below. But I could see one step ahead of me and one step behind. Then I suddenly remembered this line,

‘one step enough for me. I can carry on ; I can go on, I need not see the distant scene – one step enough for me. In spiritual life too, we need not see the distant scene nor is possible for us to see. But we have to keep ourselves on the path. One step enough for me.’ (Musings of a Monk)।

পূজনীয় মহারাজ যখন সজ্জাধ্যক্ষ তখন তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা এক সন্ন্যাসী তাঁকে বলছেন, ‘মহারাজ, কি দারুণ ব্যাপার, আপনি আজ আমাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পদে বসেছেন!’ পূজনীয় মহারাজের এই কথা শুনে প্রতিক্রিয়া, ‘তাতে কী হয়েছে ? যেহেতু প্রেসিডেন্টের পদটি ফাঁকা পড়ে গেছিল, তাই ট্রাস্টিরা মিলে প্রবীণতম আমাকে এই ফাঁকা পদটি পূর্ণ করার জন্যে পছন্দ করেছে। সুতরাং আমি এই পদে বসেছি। অতএব এতে আর এমন কি আছে ?’ এইরকম ভাবনার জগতেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ভগবান শঙ্করাচার্যের রচিত তুলনায় একটু কম পরিচিত একটি স্তোত্র পূজনীয় মহারাজের খুব প্রিয় ছিল, ‘অনাত্মশ্রীবিগর্হণম্’। এই স্তোত্রের মূল তাৎপর্যই এই, যদি আত্মতত্ত্ব একবার অনুভূত হয়, তাহলে আর অন্য কী বাকী থাকে – ‘ততঃ কিম্’? একদিকে এই আত্মতত্ত্বচর্চা, অপরদিকে প্রবল ভক্তির ফলস্রোত বয়ে যেত পূজনীয় মহারাজের ভিতরে। শ্রীরূপ গোস্বামীর লেখা, ‘যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী’ শ্লোকটিও তাঁর তাই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীরামের ভজন, শ্রীকৃষ্ণের ভজন যখনই শুনতেন মহারাজ, তখনই এক ভাবের জগত যেন তাঁর মধ্যে আবির্ভূত হতো।

কিছুদিন ধরেই পূজনীয় মহারাজ শারীরিক নানা অসুস্থতায় অল্পবিস্তর ভুগছিলেন। একদিন সেবক পূজনীয় মহারাজের স্নানের শেষে তাঁকে বাইরে এনে বসিয়ে দিয়েছেন, যাতে জানালা দিয়ে মন্দিরগুলো দেখতে পান। কিছুক্ষণ পর মহারাজ বললেন, চলো। সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন? ঘরে? মহারাজ বললেন, ঘর তো একটাই। ঠাকুর, মা, স্বামীজী যেখানে আছেন। ঘর বলতে ওখানে যেতে হবে। এখন এখানে সব হয়ে গেছে। সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে বলতে? মহারাজের উত্তর ছিল, ইহলোকে যা করার সব হয়ে গেছে। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে পূজনীয় মহারাজ কামারপুকুর ও জয়রামবাটিতে যান। জয়রামবাটিতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পূজনীয় মহারাজের শরীর খারাপ হয় – বুকে সংক্রমণ ধরা পড়ে। ওইদিনই তাঁকে দ্রুত কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই মাস পরে অনেকটা সুস্থ হয়ে তাঁর প্রিয় স্থান নরেন্দ্রপুর আশ্রমে যান কিছুদিন হাসপাতালের কাছে থেকে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্যে। এখানে তাঁর স্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু হঠাৎই ২০২৪-এর ১৮ই জানুয়ারি তাঁর জ্বর আসে এবং রক্তচাপ নামতে থাকে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আবার পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাঁকে নিয়ে আসা হয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ২৯এ জানুয়ারি। এক মাস পরে তাঁর সেপ্টিসিমিয়া ধরা পড়ে এবং ৩রা মার্চ তাঁকে ভেন্টিলেটর-সাপোর্টে রাখা হয়। ১৩ই মার্চ ট্র্যাকিওস্টমি করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়। তবুও সাধু-ভক্তদের প্রণাম নিত্যদিনের মতই হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের সকলের সর্বাত্মক প্রয়াস ব্যর্থ করে পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেন ২৬এ মার্চ রাত ৮টা ১৪ মিনিটে। মুখ থেকে সর্বঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে যায় এক অপূর্ব দিব্য আভা – তাঁর নিজের পছন্দের ঘরে ফেরার অলোকসামান্য প্রশান্তি।

দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে পূজনীয় মহারাজের মহাসমাধির সংবাদ। বিভিন্ন

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সেবাপ্রতিষ্ঠানে অনেক ভক্তরা এসে উপস্থিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, ‘Srimat Swami Smarananandaji was one of the leading lights in Indian spiritualism...In his passing, we may have lost his earthly presence but his life and messages will continue to be an inspiration for us.’ উপরাষ্ট্রপতি তাঁর শোকবার্তায় মানুষের সেবায় পূজনীয় মহারাজের অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, ‘His compassion and wisdom will continue to inspire generations’. এছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ প্রভৃতি আরো অনেকে তাঁদের শোকবার্তা প্রেরণ করেন।

ওইদিন মধ্যরাত্রেই পূজনীয় মহারাজের পার্শ্ব শরীর নিয়ে আসা হয় বেলুড় মঠে। সেই রাত থেকে পরের দিন ২৭ তারিখ রাত আটটা পর্যন্ত বেলুড় মঠের সংস্কৃতি ভবনে শায়িত থাকেন পূজনীয় মহারাজ। অগণিত ভক্ত-অনুরাগী, সাধু-ব্রহ্মচারী তাঁকে দর্শন করেন। ২৭ তারিখ রাত ৮টা ২০ মিনিটে সেই পুণ্য শরীর নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির, স্বামীজীর ঘরের সামনের মঠের ঐতিহ্যমণ্ডিত উঠোন, রাজা মহারাজের মন্দির হয়ে পূজনীয় মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হয় মায়ের মন্দিরের সামনের গঙ্গাঘাটে। যথাবিধি স্নানাদি সমাপনান্তে মায়ের মন্দির ও স্বামীজীর মন্দির দর্শন শেষে পূজনীয় মহারাজের বাসগৃহের সামনে অল্পক্ষণ থেমে সমাধিপ্ৰাপ্তি এসে উপস্থিত হয় সেই দীর্ঘ যাত্রা। ধীরমন্দ্র ‘হরি ওম্ রামকৃষ্ণঃ’ ধ্বনিতে তখন আকাশ স্পন্দিত। ধীরে ধীরে অগ্নিস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র সেই সন্ন্যাসী-দেহ। সমবেত কণ্ঠে তখন গীত হতে থাকে আনন্দধামে যাত্রারস্তের সুর-বাণী – ‘ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম’। ক্রমে সেই পবিত্র বহিঃশিখায় লীন হয়ে যায় শরীর। ভস্মাস্থি নিয়ে সেবক মহারাজেরা তখন গঙ্গার ঘাটে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই রাতের আকাশে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির জল। ভক্তমন ভাবতে থাকে, কে জানে কোন এক উর্ধ্বলোকের দিগন্ত থেকে হয়ত নেমে আসছে পুষ্পবৃষ্টি। আর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ‘অনপেক্ষ’। শোক-তাপিত জগত তো তাঁর জন্যে নয়। তিনি যে সদা আত্মলীন।

শেষ হয়ে যায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দিব্যপ্রবাহময় ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়। স্বামী স্মরণানন্দজী – এক অপূর্ব দিব্য জীবন : অন্তরে নিত্য শরণাগত, বাইরে একেবারেই অনাড়ম্বর ; ভিতরে মাতৃগতপ্রাণ, বাইরে জ্ঞানের এক দীপ্ত আভা ; নিজে সেরিয়ে রেখে সঙ্ঘের জন্যে, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-র এই বিরাট ভাবযজ্ঞে নিবেদিত এক অনিঃশেষ আছতি – ভক্ত-শিষ্যদের কাছে তিনি নির্ভরতাময় দীক্ষাগুরু, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের কাছে তিনি সদাশাস্যময়, অভিমান-জয়ী কিন্তু এক গভীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। নিজেই লিখেছিলেন অনেকদিন আগে তাঁর প্রিয় মায়াবতীর দিব্য নির্জনতার সামনে বসে, ‘Voices mingle, hearts unite in harmony, and Peace undisturbed alone remains!’ সমস্ত ধ্বনির অতীতে, আজ তিনি ‘স্বৈ মহিম্নি’ বিরাজিত – সেখানে শুধু সমুখে শান্তি পারাবার। সে শান্তির কৃপাকবিকা ঝরে পড়বে অনাদ্যন্ত কাল ধরে – শক্তি দেবে সাধককে, প্রেরণা জাগাবে অনন্তের তীর্থযাত্রীদের নিত্যকাল।

